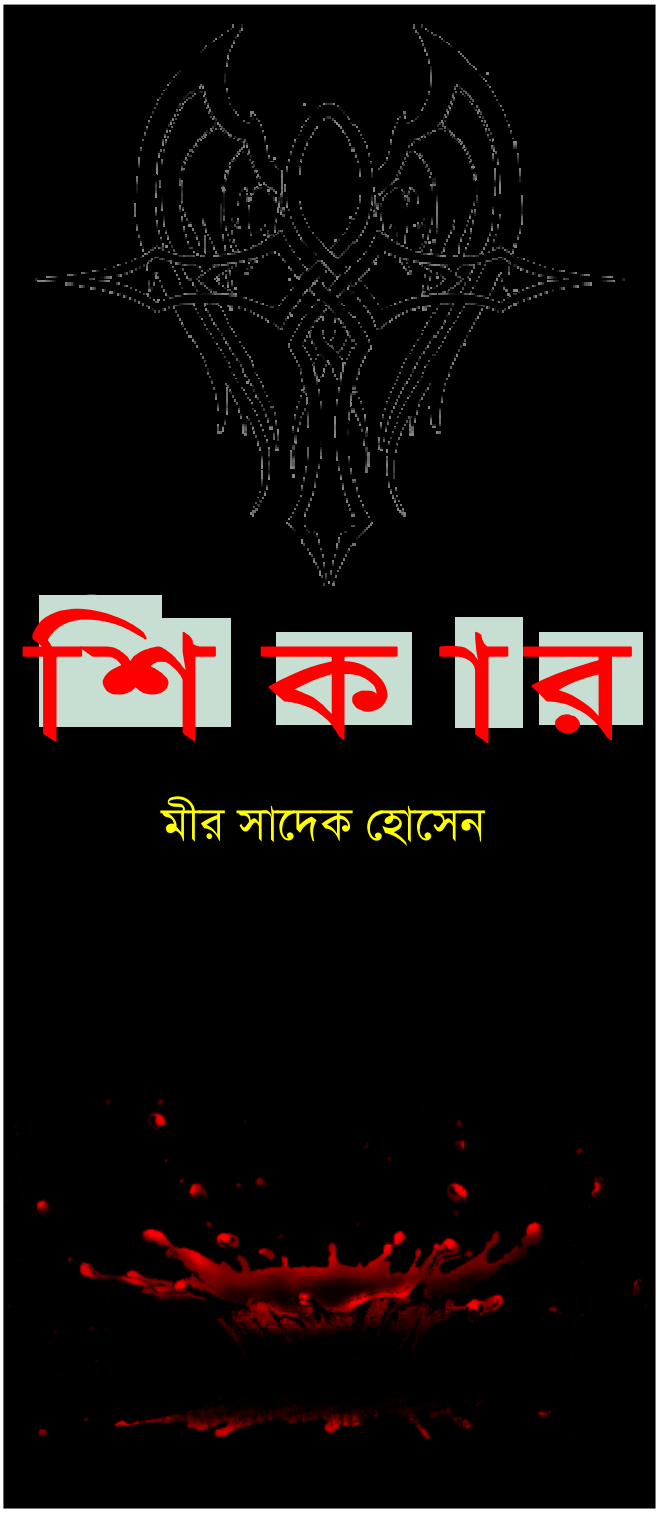

১

"এখন কেমন আছিস?"

"গতকালের চেয়ে ভাল। তবে মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে।"

"সহ্য করতে পারিস না তো, ওসব "ট্রাই" করতে যাস কেন? এসব বাচ্চাদের জন্য নয়।"

"ইহ...আমাকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে! এক্সপেরিমেন্ট নিজে তো কম করিস না। সত্যি বলছি গতকাল পার্টিতে আমি কিছুই ট্রাই করিনি। এমন কি একটা বিয়ার পর্যন্ত না।"

"কিন্তু তুই হঠাৎ টেবিলের উপর যেভাবে নাচানাচি শুরু করলি...পেটে কিছু না পড়লে কি ওভাবে কেউ নাচে?"

"আমি এখন কিছুই মনে করতে পারছিনা। খুব "স্টুপিড" এর মতো দেখাচ্ছিল নারে!"

"নিজের উপর কন্ট্রোল না থাকলে তো স্টুপিডের মতো লাগবেই।"

"খালি নেচেছি নাকি এর থেকেও আরও বেশী কিছু? জামা কাপড় ঠিক ছিল?"

"ও স্টেজে যাবার আগেই তো, তোকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। নিজেও "এঞ্জয়" করতে পারলি না আমাকেও "এঞ্জয়" করতে দিলি না। কতদিন পর এমন দারুণ একটা পার্টি হচ্ছিল। কিপ্টা শিপলু কিপ্টা হলে কি হবে দারুণ পার্টি "অ্যারেঞ্জ" করতে জানে, তাই না?"

নুবিরা কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "সরি অমি। তোর "এক্সাইটমেন্টে" পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত। আমার কাছে তোর পাওনার লিস্টটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বল তোর জন্য আমি কি করতে পারি?"

"থাক আর মেলোড্রামাটিক হতে হবে না। তবে দিতে যখন চাইছিস তখন তো আর মানা করতে পারি না। কিন্তু বিপদে ফেলে দিলি তো। তোর কাছে আমার অনেক কিছু চাওয়ার ছিল এখন তো চট করে সব মনেও করতে পারছিনা।"

"তুই আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে নিঃস্ব করে দিতে চাইছিস?"

"আরে না না...বন্ধু হয়ে আমি কি বন্ধুর এত বড় ক্ষতি করতে পারি। তবে বিপদ থেকে উদ্ধারের মূল্য তো একটু চড়া হবেই।" বলে অমি মুচকি হেসে উঠল। তারপর বলল, "আচ্ছা যা বেশী কিছু চাইব না...এইবার তোকে অল্পের উপর দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। "ব্লু বেরীতে" লাঞ্চ, তোর কাছে "হোয়াইট" ব্যান্ডের গিটারিস্ট শাওনের যে পোস্টারটা আছে সেটা আর..." এইটুকু বলে একটু থামল অমি। ফোনের ওপাশে নুবিরার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করল।

লাঞ্চ খাওয়াতে নুবিরার কোন কষ্ট নেই কিন্তু গিটারিস্ট শাওনের পোস্টারটা দিয়ে দিতে হবে ভেবে আরেকটু হলে চোখ ভিজে যেত নুবিরার। গতবারের পহেলা বৈশাখের কনসার্টের সময় তোলা। তারপর অনেকদিন বাবার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করার পর সেটাকে পোস্টার সাইজ করে দিয়েছিলেন। এখন সেটা দিয়ে দিতে হবে ভাবতেই নুবিরার চোখ জলই চলে এলো। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, "আর..."

অমি আনন্দিত গলায় বলল, "তোর গলা এত "স্যাড" শোনাচ্ছে কেন? "চিয়ার আপ নুবিরা"। আর বেশী কিছু না...শুধু অভ্রের সাথে একবার ডেটিং এ যাবার পারমিশন।"

নুবিরা ওপাশ থেকে চিৎকার করে উঠল, "কে কোথায় আছ...আমার সব নিয়ে গেল...আমি বর্বাদ হয়ে গেলাম...ও "গড" আমাকে এ নিঃস্ব জীবন থেকে মুক্তি দাও। তুই তো দেখি সাংঘাতিক। নিজের বয় ফ্রেন্ড থাকতে আবার আমারটাকে নিয়ে টানছিস?"

নুবিরার কথা শুনে অমি হেসে উঠল, "আচ্ছা আচ্ছা পারমিশন দিতে হবে না। তোর অভ্র তোরই থাক...তবে পোস্টার আমি কিন্তু ছাড়ছি না। শাওনটা দারুণ কিউট...শাওনের কথা ভাবতেই তো আমার গাল লাল হয়ে যাচ্ছে। পোস্টার দেওয়ার কথা পরে আবার ভুলে যাবি না তো?"

"না ভুলব না। "ইটস্ এ ডিল"।"

"এই তো আমার সুইট নুবিরা। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। কিছু না খেলে তুই ওভাবে নাচলি কেন? নাকি নাচের ভান করছিলি?"

"কি যে বলিস...ভান করব কেন? আমার শুধু মনে আছে আমি জিসানের সাথে গল্প করছিলাম। ও জানতে চাইল আমার কোন ড্রিঙ্ক

পছন্দ। আমি বলেছিলাম "কোক" হলেই চলবে। ও ওর জন্য বিয়ার আমার জন্য "কোক" নিয়ে এসেছিল। "কোক" এ দু তিন চুমুক দেয়ার পর থেকে মাথাটা কেমন যেন হাল্কা লাগতে লাগল। একসময় মনে হচ্ছিল আমি যেন আকাশে ভাসছি। আমার কোন দুঃখ নেই। কোন পিছুটান নেই। চাইলে যা খুশি তাই করতে পারি।"

অমি কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "হু তাই তো দেখলাম...শিপলুদের লাউঞ্জে টেবিলের উপর উঠে গেলি। আর মিউজিকের তালে তালে যেভাবে হাত পা ছুড়ছিলি, হিন্দি সিনেমাতে নাম লেখালে খুব নাম করতে পারবি।"

"ঠাট্টা করিস না তো।" নুবিরা বিরক্ত হয়ে বলল।

"ওকে বাবা ঠাট্টা বাদ। আচ্ছা তোর কি মনে হয় তোর ড্রিঙ্কে কিছু মেশানো ছিল?"

"কি করে বলি? টেস্টে তো কোন পরিবর্তন ছিল না। তবে জিসানকে আমার সুবিধার মনে হয়নি। কথাবার্তা যেন একটু কেমন কেমন। বলে কি ও নাকি কি মুভি বানাচ্ছে, আমাকে তার নায়িকা করতে চায়। আমি মুভির ডিটেলেস জানতে চাইলাম। ও বলল এসব মুভি বানানো নাকি খুব সহজ শুধু পারফর্মারদের একটু সাহসী হতে হয়। আর সাহস বাড়ানোর ম্যাজিক নাকি ওর কাছে আছে। ওই ম্যাজিকে যে কেউ যা খুশি করতে পারে। ওর কথা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। আমি এড়ানো জন্য বললাম ভেবে দেখব। ততক্ষণে মাথা হাল্কা লাগতে শুরু করেছিল। তারপর আর মনে নেই।" একটু থেমে নুবিরা আবার বলল, "আচ্ছা জিসান কার ফ্রেন্ড? শিপলুদের সার্কেলের নাকি?"

"কদিন আগে ইন্টারনেটে এক বাংলা চ্যাটরুমে পরিচয় হয়েছিল। শিপলুর পার্টির কথা শুনে আমি ওকে শিপলুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। "হোস্ট" এর পরিচিত না এমন তো কত লোকই পার্টিতে আসছে। তাই ভেবেছিলাম নতুন কেউ এলে পার্টি জমবে ভাল।"

"কি করে জানিস?"

"এত কি মনে আছে নাকি। বলেছিল পড়াশোনা শেষ করে এখন নাকি কি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস করছে। কিসের বিজনেস জিজ্ঞেস করিনি।"

"আচ্ছা বাদ দে জিসানের কথা। তুই আসবি কখন?"

"আহ তোর দেখি শেলী মিসের অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। "ডোন্ট ইউ অরি", সময় মতো চলে আসব। বিকেলে আর একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে তার নাম মনন।"

"ও আগে বলবি তো। এই অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে তো সময় লাগবে। চেষ্টা করিস তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"

"চিন্তা করিস না...সন্ধ্যায় দেখা হবে। ভাল থাকিস। বাই।" অমি ফোন রেখে দিল।

অমি বিছানার মাটট্রেসের নিচ থেকে ডাইরি বের করল। গোটা দশেক পাতা উল্টে একটা খালি পাতা বের করে তারিখ দিল। তারপর গত রাতে ঘটে যাওয়া নুবিরার পাগলামির ঘটনাটা লিখে ফেলল। লেখা শেষ হলে ডাইরিটা আবার ম্যাটট্রেসের নিচে লুকিয়ে রাখল।

বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমি নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সামনে থেকে তারপর পাশ ফিরে। পাশ ফিরে আয়নার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেরুদণ্ডকে যতটা সোজা করে মানুষের পক্ষে রাখা সম্ভব অমিও সোজা রাখল। স্লিভলেস টি শার্টের ভেতর দিয়ে নিজের থার্টি থ্রি সি কাপের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল আরেক এক সাইজ বড় হলে কার এমন কি ক্ষতি হত। তারপর দৃষ্টি ধীরে ধীরে আয়নার নিচের দিকে নামতে লাগল। একসময় নিতম্বের কাছে এসে থামল। কালো থ্রি কোয়াটার্সের উপর দিয়ে দুই হাতের দুই তালু নিতম্বের উপর রাখল। নিজের নিতম্বের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আবারও বলল কার এমন কি ক্ষতি হত।

বাসার ভেতরে যেসব জায়গা অমির প্রিয় তার মধ্যে নিজের বেডরুমের বিল্ট ইনের সাথে লাগানো আয়নার সামনের জায়গাটা অন্যতম। কাজ না থাকলে নিজেকে দেখে আর নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করে কাটিয়ে দিতে পারে দীর্ঘ সময়। সাড়ে চারটায় মননকে সময় দেওয়া আছে। এখনও তিরিশ মিনিট বাকী। মননকে চাইলে বসিয়ে রাখা যায়। একটু নয় অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু অমির মন সায় দেয় না। অমি বরং সবসময় মননকে চমকে দেবার জন্য সময়ের আগে উপস্থিত হয়। দু একবার যে মনন জেতেনি তা না।

অমি পোশাক পাল্টে নিলো। ঘর থেকে বের হবার আগে মানিব্যাগ খুলে বুঝল বাবা অথবা মা"র সাথে দেখা করা দরকার। টাকার ব্যাপারে অমির পছন্দ বাবা অমিতের রায়হানকে। টাকা নিয়ে মেয়েকে কোন প্রশ্ন করেন না। ব্যাপারটা যেন "চাহিবা মাত্র এর বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবেন"। অমি জানে বাবা এখন বাড়িতে নেই। মা"র কাছে চাইতে হবে। অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অমি স্টাডিরুমের দিকে এগুলো।

স্টাডিরুমের দরজা খোলার শব্দ হতে মিথিলা রায়হান দরজার দিকে তাকালেন, "অমি, তোকে না বলেছি, আমি যখন স্টাডিরুমে থাকব তখন আমাকে ডিস্টার্ব করবি না।"

"সরি মা...ভুল হয়ে গেছে।"

"এখন কোথায় যাচ্ছিস? প্রতিদিনই পার্টি থাকে না কি?"

"না পার্টি না। নুবিরাদের বাসায় যাচ্ছি। বায়োলজির শেলী ম্যাডাম একটা খুব কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন। একা করতে পারছি না। তাই নুবিরাদের বাসায় যাচ্ছি। দুজনে মিলে করব।"

"আমি বাড়ি থাকব না। তোর বাবাকে বলিস রাতে আনতে যেতে।"

"অ্যাসাইনমেন্ট করতে কতক্ষণ লাগবে জানি না মা। তাই ঠিক করেছিলাম ওদের বাসায় রাতে থেকে কাল ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরব। এখন কিছু টাকা দাও।"

"দুদিন আগে না টাকা দিলাম।"

"শেষ হয়ে গেছে। আরও লাগবে। এত প্রশ্ন করো নাতো এখন টাকা দাও।"

মিথিলা হ্যান্ড ব্যাগ খুলে কড়কড়ে দুটো পাঁচশ টাকার নোট অমির সামনে ধরল। অমি হাত বাড়িয়ে টাকা নেবার সময় হাত ফসকে টাকা মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝে থেকে টাকা উঠানোর জন্যে অমি নিচু হতে টি শার্টের কিছু অংশ পিঠ থেকে সরে এলে পিঠের নিচের অংশে আঁকা "ট্যাটু" অনাবৃত হয়ে পড়ল।

মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায় এমনিতেই মিথিলা বিরক্ত ছিলেন তার উপর মেয়ের শরীরে "ট্যাটু" দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। মিথিলা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। মেয়ের দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে রইলেন। অমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিথিলার চোখে চোখ পড়তেই বুঝে নিল যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন শুধু আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গীরণের অপেক্ষা।

মিথিলা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আর কি কি তুই আমাদের না বলে করে বেড়াচ্ছিস?"

অমি স্থির কণ্ঠে বলল, "তোমাদের চিন্তিত হতে হবে তেমন কিছু করছি না। আর এভাবে তাকিয়ে থেকো না মা। তোমার তাকানো দেখে মনে হচ্ছে আমি ধ্বংসের অতলে এসে ঠেকেছি। "ট্যাটু" এখনকার লেটেস্ট ফ্যাশন। এটা হচ্ছে আংক, দি কি অফ লাইফ। জীবনের চাবি এখন আমার কাছে। আই ক্যান কন্ট্রোল দি লাইফ, মাম। এখন চলি। কাল দেখা হবে।" বলে বেরিয়ে পড়ল অমি।

মিথিলা কিছু কড়া কথা বলতে চাইছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল।

অমি ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকী। "ক্যাফে ব্লু বেরী" এর ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মনন এখনও এসে পৌঁছায়নি। একটা "মোকাচিনো" অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মননকে এখনও "ট্যাটু" এর কথা বলা হয়নি। অমি মনে মনে বলল না জানি মনন আবার কি বলে বসে। যা বলে বলুক।

মাথার পেছন থেকে অমির চোখ ঢেকে দিল এক পরিচিত হাত। অমি ভাবল মনন হয়তো। বলল, "এতক্ষণে আসার সময় হল তাহলে।" তারপর পেছনে তাকিয়ে দেখল জিসান। অন্ধকার ঘরে জ্বলন্ত মোম হঠাৎ নিভে গেল যেমন গভীর অন্ধকার ছেয়ে ফেলে, অমির মুখেও তেমন অন্ধকার ফুটে উঠল।

জিসান সামনে বসতে বসতে বলল, "কি ব্যাপার মুখ অন্ধকার করে বসে আছ কেন? আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি?"

অমি মুখে কিছু বলল না, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। এমন সময় ওয়েটার এসে "মোকাচিনো" দিয়ে গেল। চুমুক দিয়ে অমি জানতে চাইল, "তুমি কোত্থেকে?"

চোখ থেকে সানগ্লাসটা নামিয়ে জিসান বলল, "তোমাদের এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ক্যাফের ভেতরে দেখলাম বসে আছ। তাই ভাবলাম হ্যালো বলে যাই।"

চেয়ারের পাশে মেঝের উপর রাখা অমির হান্ডব্যাগের ভেতরে মোবাইলে ম্যাসেজ আসার রিংটোন বেজে উঠল। ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করার জন্য অমি শরীর বাঁকালো। মুহূর্তে জন্য "মোকাচিনো" এর মগ থেকে অমির দৃষ্টি চ্যুতি ঘটল। সোজা হয়ে দেখল জিসান তাকিয়ে আছে মুখে স্মিত হাসি। মোবাইলে মননের ম্যাসেজ। মোহাম্মদপুরে ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে। আসতে দেরী হবে। অমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "ট্রাফিক জ্যামের আর টাইম পেল না।"

"কিছু বললে? সব ঠিক আছে তো?" জিসান প্রশ্ন করল।

"ঠিক আছে।"

"তোমার ড্রিঙ্ক ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তো। কি নিয়েছ? তুমি যা নিয়েছ আমিও তাই "ট্রাই" করব।"

"মোকাচিনো" মগে চুমুক দিয়ে বলল অমি।

জিসান অমির দিকে এগিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল, "তোমার "মোকাচিনো" তে ম্যাজিক মিশিয়ে দিয়েছি। তার নাম স্পিড। মাত্র ২০মি.গ্রা. কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার দেহ স্থির হয়ে আসবে। ভেবো না, প্রথম প্রথম সবারই এমন হয়।"

জিসানের কথামতো অমির দেহ স্থির হয়ে এলো। মাথা দুলে উঠল। চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিল। জিসান এসে ধরে ফেলল। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েটার এসে বলল, "স্যার কোন "হেল্প" লাগবে?"

জিসান অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো বলল, "নো থ্যাংকস, তেমন কিছু না। সিজোনাল ফ্লু...টেম্পারেচারটা বেড়েছে আর কি। কত করে বললাম এই শরীর নিয়ে বেরুবার দরকার নেই। কে শোনে কার কথা। এখন দেখুন কি অবস্থা। যাক হেল্প করতে যখন চাইছেন তখন একটা সি.এন.জি ডাকুন প্লিজ। বাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে দেই।"

জিসানের কথামতো ওয়েটার দ্রুত সি.এন.জি ডেকে আনল। উঠার পর সি.এন.জি এর ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "স্যার, ম্যাডামের কি হয়েছে?"

"ম্যাডামের শরীর খুব খারাপ। সিজোনাল ফ্লু। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন প্লিজ।" নিজের অভিনয়ে জিসান নিজেই মুগ্ধ হল।

২

অমিত অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসের দিকে পা বাড়াতেই করিডোরে অপেক্ষারত একদল ছাত্র ছাত্রী ঘিরে ধরল। ছাত্র ছাত্রীদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে নীরব হসপিটালের পরিবেশ মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

অমিত জানতে চাইল, "তোমরা কারা? কি চাও? হৈ চৈ করে হসপিটালের পরিবেশ নষ্ট করবে না প্লিজ।"

নেতা গোছের একজন উত্তরে বলল, "চুপ শালা...আরিফ ভাইয়ের কিছু হলে আমরা কাউকে ছাড়ব না। আরিফ ভাইয়ের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে।"

নেতার শ্লোগানের সাথে বাকীরাও যোগ দিল, "জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে।"

অমিত ছাত্র ছাত্রী এই দলটির দিকে একবার ভাল করে চোখ বুলাল। সবার বয়স আঠার থেকে বিশের মাঝে। এই বয়সে ক্লাসের ফাঁকে ইউনিভার্সিটির ক্যাফে আর লাইব্রেরীতে ক্লাসমেটদের সাথে দুষ্টুমিতে মেতে থাকার কথা। সবাই মিলে গানে, কবিতায় আর সিনেমায় দিন পার করার কথা। এই বয়সটা আবেগের। সেই আবেগ হবে প্রেমকে ঘিরে। রাজনীতির মতো এত গম্ভীর বিষয় নিয়ে নয়। আর দেশের রাজনীতির যা অবস্থা তা নিয়ে অস্থিরতা সময় অপচয় ছাড়া আর কি। অমিতের তাই মনে হয়।

এমন পরিস্থিতির অমিতের জন্য নতুন কিছু নয়। হরহামেশাই এমন অস্থির অবুঝ ছাত্র ছাত্রীদের মুখোমুখি হতে হয়। এদের শান্ত করার ঔষধ অমিতের অজানা নয়। শিশুরা যেমন ভুল করে বাবা মার দিকে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে তাকিয়ে থাকে সান্ত্বনার বাণী শোনার জন্য। অমিত জানে এই অস্থির আঠার থেকে বিশের শিশুরাও এখন একটু সান্ত্বনার বাণী শোনার জন্যে মুখিয়ে আছে।

অমিত নেতার চোখে চোখ রেখে বলল, "তোমাদের আরিফ ভাইয়ের এখন অনেক বিশ্রাম দরকার। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তোমরা এভাবে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তখন কিন্তু আর আমাদের করার কিছু থাকবে না।"

যে আগুনে কিছুক্ষণ আগেও পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারত একটা গোটা শহর সে আগুনে যেন কেউ হিম শীতল চাদর বিছিয়ে দিল। দলের নেতার উত্তপ্ত চোখ শান্ত হতে শুরু করল। বোঝা গেল ঔষধে কাজ হয়েছে। নেতার দেখাদেখি হৈ চৈ থামিয়ে অন্যরাও শান্ত হতে লাগল। ঘিরে থাকা ক্লান্ত দলটি অমিতকে যেতে দিতে সরে দাঁড়াল। পরিস্থিতি সামলাতে পেরে অমিত নিজের মধ্যে বিজয়ের আনন্দ অনুভব করল। তবে মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে নিজের অফিসের দিকে দ্রুত পা চালাল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল শিফট শেষ হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকী। ওটির পোশাক পালটে অমিত ইমারজেন্সীতে ফোন দিল। ওপাশ থেকে ইমারজেন্সীর রিসেপশনে থাকা নার্স বিউটির গলা শুনতে পেল। বিউটি বলল, "হ্যালো ডক্টর অমিত, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?"

অমিত জানতে চাইল, "আর কেউ আছে লিস্টে?"

বিউটি বলল, "ডক্টর আজ আপনার লাকি ডে। কেউ নেই।"

অমিত থ্যাংক ইউ বলে রেখে দিল।

অমিত হিসেব করে দেখল অনেক দিন এমন হয়নি। একবার হসপিটালের সীমানায় ঢুকলে শিফট শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত দম ফেলার

সময় পাওয়া যায় না। বন্যার সময় ত্রাণ গ্রহণকারীর লাইন যেমন বাড়তেই থাকে ইমারজেন্সীতেও পেশেন্টের লাইন লেগেই থাকে। শেষ আর হতে চায় না। আর আজ এখনো আধ ঘণ্টা বাকী অথচ ইমারজেন্সীতে কোন পেশেন্ট নাই। আজকের ডে লাকি ডে নয় তো কি। আয়েশ করে কফিতে চুমুক দিতে মন চাইছে। বসে না থেকে হসপিটালের ক্যাফেটেরিয়ার দিকে পা চালাল। ক্যাফেটেরিয়ার কফি এমন আহামরি কিছু নয় তবে বিনা পয়সায় খাওয়ার জন্য খারাপ না।

অমিত ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকে কিছু ডক্টর আর নার্স কলিগদের দেখতে পেল। এক মগ ক্যাপাচিনো হাতে জানালার কাছাকাছি একটা টেবিলের দিকে এগোল। খালি টেবিল। গরম ক্যাপাচিনোতে হাল্কা চুমুক দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। জানালা দিয়ে বাইরে সবুজ গাছ আর নীল অমিতের দিকে তাকাতে অমিতের ভাল লাগা আরও বাড়ল। পেপার বাকের ডালপালার নাচ দেখে এয়ার কন্ডিশনড্ ক্যাফেতে বসেও বুঝতে অসুবিধা হয় না বাইরে দারুণ বাতাস। প্রকৃতির চঞ্চলতা মনে ভর করে।

চঞ্চল মনে কখন কি ঘটে যায়? চঞ্চল প্রকৃতির মাঝে হসপিটালে নতুন যোগ দেওয়া নার্স সুমি ও জেনিকে হেঁটে যেতে দেখল অমিত। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী না। শরীরে যৌবন আর উচ্ছলতার কোন ঘাটতি নেই। অমিতের তাকিয়ে থাকতে মন্দ লাগে না। সুমি আর জেনির সাদা ইউনিফর্মের ভেতর দিয়ে নিতম্বের উঠানামা দিব্যি উপভোগ করে। সুমি আর জেনি অমিতের দৃষ্টি সীমা পেরোনোর আগেই পেছন থেকে অরির গলা শুনতে পেল। ডঃ অরিন্দম চৌধুরী অমিতের সামনের চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমিতের দৃষ্টি কেড়ে নিল।

অমিত অরির দিকে চোখ ফেরাল। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় থেকে বন্ধুত্ব। অরি একটু ঠোঁট কাঁটা স্বভাবের। স্থান কাল পাত্রের বালাই ওর মাঝে নেই। কোন একটা কথা মাথায় এলে বলার আগ পর্যন্ত শান্তি নেই। একবার কার্ডিওলজির প্রফেসর ডঃ আতিকের ক্লাসে কি কাণ্ডটাই না করল। ক্লাসের এক ফাঁকে অরি আবিষ্কার করল যে স্যারের প্যান্টের জিপার খোলা। ক্লাসে শেষের দিকে অরি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। স্যার ক্লাসে সবার উদ্দেশ্যে যখন জানতে চাইলেন আজ যা পড়ানো হল তা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা? অরি সোজা দাঁড়িয়ে বলল স্যার আজ আপনার জিপার খোলা কেন? পানি ভরা বেলুনে চোখা কিছু দিয়ে আঘাত করলে যেমন ফিনকি দিয়ে থেকে পানি বেরিয়ে আসে, সেদিন পুরো ক্লাসের অবস্থাও হয়েছিল তাই। অরির প্রশ্ন যেন ছিল সেই চোখা কিছু। প্রশ্ন করতেই সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ে ছিল। স্যার প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও, হাসির ঝাপটা একটু হাল্কা হয়ে এলে বলেছিলেন, "ইয়াং ম্যান, ডক্টরদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হওয়া উচিত তোমার মতো। গুড ওয়ার্ক। কিপ ইট আপ।"

অরি সামনে বসতে বসতে বলল, "কিরে এমন ড্যাব ড্যাব করে কি দেখিস? আর একটু হলে ওয়াসরুমে দৌড়তে হবে তো।"

"দূর কিযে বলিস...এমনি বাইরে তাকিয়ে আছি।", অমিত মুচকি হেসে বলল।

"হ্যাঁ তা তো দেখতেই পাচ্ছি।" অরিও মুচকি হাসে। "দেখার জিনিস বাইরে থাকলে দেখবি না কেন?"

"ইয়ার্কি রাখ তো...এই বয়সে এইসব ছেলে মানুষী ইয়ার্কি মানায় না।" অমিত গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

অরি আকাশের কথার পাত্তা দেয় না। কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, "ইয়ার্কি কোথায়...এটাই সত্যি। তুই ফালতু গম্ভীর হবার চেষ্টা করছিস।" আবার কফির মগে চুমুক দিল। "আচ্ছা বল দেখি সৃষ্টিকর্তা কেন নারী শরীরটাকে এমন বাঁক দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন?"

অমিত কফির মগে চুমুক দেয়। অরির এ ধরণের প্রশ্নের সাথে অমিত পরিচিত। অমিত জানে অরি প্রশ্ন করেছে ঠিকই কিন্তু উত্তরটাও ওই শুনিয়ে দেবে, কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। হাইপোথিসিস ঝাড়ার আগে অরি প্রশ্ন দিয়ে অডিয়েন্সকে প্রস্তুত করে নেয়, এই প্রশ্নও তাই।

অরি বলল, "পারলি না...উত্তরটা কিন্তু খুব সহজ...দেখার জন্য। একটু ভেবে দেখ বাঁক শুধু নারীর শরীরে কেন? সৃষ্টিকর্তা চাইলে তো পুরুষের দেহেও ইঞ্চি খানেক বাঁক দিতে পারতেন। তিনি তা করেননি। কারণ তাহলে তো দেখার কেউ থাকবে না।"

"এটা কোন যুক্তি হল।"

"তোর ভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ সোজা সাপ্টা কোন কিছু কি দৃষ্টি কাড়ে? অবশ্যই না। তাই এই পৃথিবীর দৃষ্টি নন্দন সব কিছুই আঁকাবাঁকা। তা সেটা ইট, রড আর সিমেন্টে ঠাসা বিশাল কোন স্থাপনা হোক আর রমণীর কমল দেহই হোক। সোজা সাপ্টা জিনিসের ভক্ত হলে মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে কখনও সিডনীর অপেরা হাউস আর ইটালিতে পিসার হেলানো টাওয়ার দেখতে যেত না। তুইও জানালা দিয়ে বাইরে না তাকিয়ে থাকতি না।" ক্যাফের কাউন্টারের দিকে ইশারা করে অরি বলল, "তখন ড্রামের মতো ওই মুনমুনের পশ্চাতেও তোর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আটকে থাকত।"

অরির উদাহরণে অমিত হেসে উঠল। বলল, "তোর দৃষ্টি থেকে কারো রেহাই নেই। এত ব্যস্ততার মাঝে এ সব নিয়ে এত ভাবার সময় পাশ কখন?"

"বন্ধু চাইলে নাকি সৃষ্টিকর্তার দেখা মেলে আর দেহ, এ তো আমাদের পেশারই অংশ। এর জন্য সময় না থাকলে কার জন্য এত ছুটে চলা।"

"তবে তুই এই বয়সেও যেভাবে ছুটে চলেছিস তাতে খেই হারিয়ে ফেলবি না তো?

"খেই হারিয়ে ফেলব মানে? আমরা কি বুড়ো হয়ে গেছি নাকি?"

"না বুড়ো হয়নি তবে কালে কালে বেলা তো কম হল না। হিসেব করলে চল্লিশ পার হয়ে গেছে তাও প্রায় দু বছর হয়ে গেল।"

"একটা সময় ছিল যখন চল্লিশে বাবা মায়েরা দাদা দাদী, নানা নানী হয়ে যেতেন। নাতী নাতনির কাঁথা সেলাই আর পরপারের প্রস্তুতি নেয়াই ছিল সে সময়ের রীতি। এখন কিন্তু ধারণা পালটে গেছে। চল্লিশে বাবা মায়েরা বাবা মা"ই থাকেন। তোর কথাই ধর...কয়েক যুগ আগে হলে আজ তোর মেয়ে অমির ছেলেমেয়ের নানা হতি তুই। কিন্তু অমির বয়স আর কতই হল, এখনও আঠারোই পেরোইনি।" অরি কফি মগে ঠোঁট ছুঁয়ে বলল, "আরে ইউরোপ, আমেরিকায় তো লোকে বলে ফর্টি নাকি নিউ থার্টি। সে হিসেব করলে তো আমাদের এখন মাত্র থার্টি টু।"

"ভাল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিস", অমিত কফি শেষ করে বলল।

অরি কিছুক্ষণ অমিতের দিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইদানীং তোর কি হয়েছে বল তো?"

অমিত অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, "আমার আবার কি হবে? সব তো ঠিকই আছে।"

"না...তোকে দেখলে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক দেখায়। চোকে মুখে কিসের যেন অভাব।"

"তুই কি আমার উপর স্পাইং শুরু করেছিস নাকি?"

"তোর অবস্থা বোঝার জন্য স্পাই হতে হয় না।"

"তাহলে তুই বল আমার সমস্যা কি?" হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমিত বলল।

"আমি চিন্তা করে দেখলাম আমাদের বয়সী একজন পুরুষের যেসব চাহিদা থাকে তার মধ্যে কোন একটার ঘাটতি তোর মাঝে তৈরি হয়েছে। চাহিদার লিস্ট থেকে অর্থ নিয়ে তোর কোন সমস্যা হওয়ার কথা না। এই হসপিটালে কাজ করার সুবাদে যে স্যালারি পাস তা এই দেশের যে কোন ডক্টরে জন্যে ঈর্ষণীয়। ধর্ম আর রাজনীতি নিয়ে তোকে কখনও ভাবতে দেখিনি। তুই নতুন করে ভাবনা শুরু না করলে এই দু ক্যাটাগরিও বাদ।"

অমিত মাথা নেড়ে সায় দেয়।

"বাড়িতে কোন সমস্যা? অমি অথবা মিথিলার কোন সমস্যা হলে আমরা নিশ্চয় এতক্ষণে জেনে যেতাম।"

অমিত আবারো মাথা নেড়ে সায় দেয়।

"তুই কি মিথিলা ছাড়া আর কারো প্রতি দুর্বলতা অনুভব করছিস?

অমিত চোখ কুঁচকে বলে, “না।”

মৃদু হেসে অরি বলে, “চাহিদার লিস্টে তাহলে আর একটা আইটেমই শুধু বাকী থাকে।”

“কি সেটা?”

অমিতের দিকে ঝুঁকে অরি একটু গলা নিচে নামিয়ে প্রশ্ন করে, “তোর আর মিথিলার লাভ লাইফের অবস্থা কেমন?”

অমিত জানে অরি অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে অবলীলায় প্রশ্ন করে যেতে পারে। অনেকদিন একসাথে থাকার সুবাদে আগেও অরির অনেক অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীন অমিতকে হতে হয়েছে। তবে আজকের এই প্রশ্নের জন্য অমিত একদমই প্রস্তুত ছিল না। অমিত ঢোক গিলে কোন রকমে উত্তর দিল, “দারুণ।”

অরির বুঝতে কোন অসুবিধা হল না অমিত দ্রুত প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অরি ছাড়বার পাত্র নয়। জানতে চাইল, “শেষ কবে তোরা লাভ মেক করেছিস?”

প্রশ্নটা অমিতকে লজ্জার সাথে ভাবনাও ফেলে দিল। মনে মনে ভাবল, “সত্যিই তো শেষ কবে মিথিলাকে কাছে পেয়েছিলাম, মনেই করতে পারছি না।”

মুখ কাঁচুমাচু করে কোন মতো বলল, “রিসেন্টলি।”

অরি অস্থির হয়ে বলল, “রিসেন্টলিটা কবে?”

অরির প্রশ্নের হাত থেকে পালানোর পথ নাই। অমিত অরি দিকে তাকিয়ে বলল, “চার বছর হবে।”

অরি আর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারল না। অমিতের উত্তর শোনা মাত্র শব্দ করে বলে উঠল, “চার বছর।”

ক্যাফেটেরিয়ার উপস্থিত সবাই অরি আর আকাশের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে যে যার কাজে আবার মনোযোগ দিল। অরি এবার নিচু গলায় বলল, “চার বছর...আর তুই বলছিস তোর লাভ লাইফ "দারুণ"। তুই তো দারুণ শব্দটার মানেই পরিবর্তন করে দিলি। আচ্ছা...তোদের দুজন কি দুজনের সাথে কথা বলিস?”

“হু তা বলব না কেন? সকালে ব্রেকফাস্টের সময়, আমার রাতে শিফট না থাকলে ডিনারের সময় টুকটাক কথা তো হয়ই। আর উইকেন্ডে তো দুজনেই বাসায় থাকি। আগের মতো কথা হয় না ঠিক, তবে হয়।"

“তাহলে দুজন দুজনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেললি কিভাবে? তোর সিস্টেম এখনও কাজ করে?”

“কি যে বলিস, সিস্টেমে কোন সমস্যা নেই।” তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় অমিত। “এখন আর কচি খোকাটি নেই তবে এই বয়সেও তালগাছের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে আকাশে উঁকি মারতে কোন সমস্যা হয় না।”

অরি দুষ্টু হাসি ঠোঁটে চেপে বলে, “তাহলে আমার মনে হয় একি জিনিসের স্বাদ নিতে নিতে তোদের আকর্ষণের গায়ে চড়া পড়ে গেছে। স্বাদ পরিবর্তনে আকর্ষণ ফিরে আসতে পারে।”

“সেটা কিভাবে সম্ভব?” অবাক চোখে প্রশ্ন করে অমিত।

“কোন কিছুই অসম্ভব নয় বন্ধু। সব রোগেরই ঔষধ আছে। এরও আছে। রোগীর শুধু প্রয়োজন রোগ নিরাময়ের ইচ্ছা।”

“কিন্তু কিভাবে?”

“সুইংগার ক্লাবের নাম শুনেছিস?

“এই দেশে সুইংগার ক্লাব? এসব তো শুনেছি উন্নত দেশের উন্নত চিন্তা ভাবনার ফসল। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কি এসব সম্ভব?”

“অসম্ভবের কি আছে? বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে পারে। তবে আনন্দ উপভোগের সব ব্যবস্থাই এ দেশে বিদ্যমান। কষ্ট করে ইউরোপ আমেরিকা যাবার দরকার নেই। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায় তাহলে বাংলার মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে চাইলে সমস্যা কোথায়?”

“না কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমার একার আকর্ষণ বাড়িয়ে লাভ কি? তাতে তো দুজনের রোগ সারবে না।”

“আমি তোর একার রোগ সারার কথা বলেছি নাকি? এত সেলফিস হলে কিভাবে হবে? সমস্যা যেহেতু দুজনের...দুজনকেই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। একা কিছু করতে গেলে বরং রোগ আরো বাড়তে পারে।”

“কিন্তু...?”

“প্রথম প্রথম সবার মনেই কিন্তু থাকে। ক্লাবের ভেতরে একবার ঢুকলে "কিন্তু" দূর হতে বেশীক্ষণ লাগে না।”

“না আমি ভাবছি মিথিলার কথা।”

“মানুষের জন্ম হয় কিউরিসিটি আর ফ্যান্টাসি নিয়ে। অন্যের হাড়ির খবর জানতে সবারই ভাল লাগে। মিথিলারও খারাপ লাগার কথা না। আর "ইন্টিমেসি উইথ আ স্ট্রেঞ্জার" তো উইমেনদের ওয়ান অফ দা বিগেস্ট ফ্যান্টাসি।

আর ওখানে যাওয়া মাত্রই তোদের অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তা না। ডিনারের ব্যবস্থা আছে। প্রথম দিন ডিনার করতে যেতে পারিস। জায়গা পছন্দ হলে আরেকটু ঘুরে ফিরে দেখলি আর না হলে চলে এলি। নো স্ট্রিং অ্যাটাচড্। তোরা চাইলে আমি আর মৌরি তোদের সঙ্গ দিতে যেতে পারি।”

“তুই এত সব জানলি কি করে?”

“গুগল আছে না...গুগলে সার্চ দিলে সব পাওয়া যায়।” অরি বা চোখের ভ্রু উঁচিয়ে বলে।

“হাহ...ভেরী ফানি।” অমিত হেসে উঠে। “তোরা আগে গিয়েছিলি নাকি?”

“লাইফটাকে স্পাইস আপ করতে তো ইনিশিয়েটিভ নিতেই হয় নইলে তো জীবন একঘেয়ে হয়ে যাবে। একঘেয়ে জীবন কার ভাল লাগে? যেতে চাইলে বল। ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।”

“আচ্ছা মিথিলার সাথে কথা বলে দেখি।” হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমিত বলল, “আজ উঠছি। আমার শিফট শেষ।”

“তোর শেষ আর আমার শুরু। থাকবি কিছুক্ষণ নাকি বাড়ি চলে যাবি?”

“আজ আর থাকব না। বাড়ি চলে যাব। কাল দেখা হবে।” অমিত উঠে পড়ল।

৩

মিলনায়তনে উপস্থিত সবাই যেন নাটকের শেষ দৃশ্যে এমন একটা পরিণতিই আশা করছিল। নায়িকার হাতে বিশ্বাসঘাতক নায়কের মৃত্যু। দর্শক সারি থেকে একজন দর্শক তো উত্তেজনার বশে বলেই ফেললেন, “ সাবাস”। মিলনায়তনে করতালির শব্দ যেন আর থামতেই চায় না। মঞ্চে পর্দার ওপাশ থেকে সবই কানে আসছিল মিথিলার। আনন্দে কয়েক বার কেঁপেও উঠল। নাট্য নির্দেশক এস. এম. মানিকের চোখ আনন্দে বিস্ফোরিত। নিজের উত্তেজনা ধরে রাখতে না পেরে মঞ্চে ছুটে এলেন অভিনন্দন জানাতে, “দারুণ হয়েছে মিথিলা, শেষ শো তে একবারে বাজিমাত করে দিলে। তুমি যে মঞ্চের নাম্বার ওয়ান অভিনেত্রী তা আবারও প্রমাণ করলে।”

এস. এম. মানিকের প্রশংসা শুনতে মিথিলার খারাপ লাগে না। তবে গুনি শিল্পীরা ভাল লাগাটা কখনও বুঝতে দিতে চায় না। মিথিলা আহ্লাদের সুরে বলে, “আপনি শুধু শুধু বাড়িয়ে বলছেন মানিক ভাই।”

“একটুও বাড়িয়ে বলছিনা। মঞ্চে এই বুড়ো মানিকের বয়স্থ আর কম হল না। অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী তো দেখলাম। তোমার মতো অভিনেত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।” এবার মঞ্চে পড়ে থাকা সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “মার্ভেলাস সঞ্জু, একদম যেমনটি চেয়েছিলাম। দেখে

মনে হয়েছে নায়িকা যেন সত্যি তোমার বুকে ছুড়ি চালিয়ে দিয়েছে। দারুণ।"

"ধন্যবাদ মানিক ভাই", বলে সঞ্জয় উঠে বসল।

"তোমরা রেডি হয়ে নাও। দর্শকদের বিদায় জানাতে হবে তো।"

নির্দেশকের নির্দেশে নাটকের পাত্র পাত্রী সকলে দু'সারিতে মঞ্চে এসে দাঁড়াল। মঞ্চের পর্দা আরেকবার উঠে গেল। মিলনায়তনের উপস্থিত দর্শকের করতালিতে মিলনায়তন আরেকবার মুখরিত হয়ে উঠল। মাথা নুয়ে উপস্থিত দর্শকদের বিদায় জানানোর পর মঞ্চের পর্দা আবার ধীরে ধীরে নেমে এলো।

সকলে মঞ্চ ত্যাগ করে ড্রেসিং রুমের দিকে এগোল। মেক আপ তোলার সময় মিথিলা লক্ষ্য করল বা কানের ঝুমকাটি নেই। ড্রেসিং টেবিলের আশপাশ খুঁজে দেখল। না কোথাও নেই। তখন সকলের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি কেউ কোন এয়ার রিং খুঁজে পেয়েছ?"

রুমের অন্যপাশ থেকে শিরিন বলল, "আপু, আমি মনে হয় স্টেজে কিছু পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ওটা আপনার এয়ার রিং।"

শিরিনের কান্ডজ্ঞানহীনতায় মিথিলা বিরক্ত হল। নিজেকে সামলে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা নাটকের নির্দেশক মানিককে উদ্দেশ্য করে বলল, "মানিক ভাই, দয়াকরে কাউকে পাঠান না, প্লিজ।" তারপরই আবার বলল, "না থাক লাগবে না, আমিই যাচ্ছি।"

যাবার সময় মানিক বলল, "তুমি ইমিটেশনের একটা রিং নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পরে কাউকে পাঠিয়ে ওটা কালেক্ট করে নেব।"

"ওটা ইমিটেশনের রিং না। সলিড গোল্ডের আমার পারসোনাল এয়ার রিং।" মিথিলা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সঞ্জয় এমন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। পা টিপে টিপে মিথিলাকে অনুসরণ করল। মিথিলা মঞ্চে পৌঁছতেই শিকারি বাঘের মতো পেছনে থেকে সঞ্জয় মিথিলাকে জড়িয়ে ধরল। মিথিলা প্রথমে চমকে উঠেছিল। তবে সঞ্জয়ের "ম ব্লা" পারফিউমের গন্ধ ধরতে মিথিলার বেশী সময় লাগেনি। এ গন্ধ মিথিলার অনেক দিনের চেনা।

মিথিলা বলল, "কি হচ্ছে এ সব? ছাড় বলছি। কেউ দেখে ফেলবে তো।"

সঞ্জয় পাত্তা দেয় না, "দেখলে দেখুক। আমি কাউকে ভয় পাই না।"

"তুমি কিন্তু ইদানীং খুব পাগলামি শুরু করেছ। বলা নেই কওয়া নেই পাবলিক প্লেসে জড়িয়ে ধর। কেউ দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে কিন্তু।"

"কি করব তুমি কাছে এলে পাগলামি বেড়ে যায়। তুমি কাছে এলে নিজেকে ঠিক রাখা বড় দায়।"

"খুব হয়েছে...আর কাব্য করতে হবে না। আমাদের বয়স কত হল সে খেয়াল আছে?"

"খুব আছে...তোমার একচল্লিশ আর আমার সাইত্রিশ। কিন্তু প্রেম তো বয়স মানে না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ছাড় তো।"

"ছাড়তে পারি তার আগে আমাকে খুশি করতে হবে।"

"খুশি করব তোমাকে? একবারও বলেছ আজ আমার অভিনয় কেমন হল?"

"বলার আর সুযোগ পেলাম কই? যেভাবে তোমার নাম আজ বাতাসে ধ্বনিত হল তারপর তোমার অভিনয় নিয়ে কিছু বলার বাকী থাকে?"

"আমার তোমার মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগে।"

সঞ্জয় পেছন থাকে মিথিলার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর চিবুকে ঠোঁট ছুঁয়ে বলল, "অসাধারণ। ইউ ওয়্যার গ্রেট।"

মিথিলা প্রতিউত্তরে সঞ্জয়ের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

কানের ঝুমকা হাতে মিথিলা ড্রেসিং রুমে ঢুকতেই সকলে একসাথে বলে উঠল, "আপু, আমরা সবাই এখন "ভূতে" ডিনার করতে যাচ্ছি। আপনিও চলেন। প্লিজ।"

এমন আবেদনে কি সাড়া না দিয়ে থাকা যায়। মিথিলাও সাড়া না দিয়ে পারল না। বলল, "যেতে পারি এক শর্তে, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। আজ আমি গাড়ি আনিনি।"

সঞ্জয় বলল, "নো প্রবলেম, ম্যাডামকে আমি পৌঁছে দেব।"

" সঞ্জয় ভাইয়া জিন্দাবাদ, সঞ্জয় ভাইয়া জিন্দাবাদ।" বলতে বলতে সবাই "ভূতের" উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ডিনার শেষে সঞ্জয় মিথিলাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। ড্রাইভ করতে করতে সঞ্জয় বলল, "তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হবে না।"

মিথিলা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সঞ্জয়ের দিকে ফিরে বলল, "অনেকদিন কোথায়...নেক্সট উইক থেকেই তো আবার রিহার্সাল শুরু হচ্ছে। নেক্সট উইক শুরু হতে মাত্র চারদিন বাকী। টানা তিন উইক শো করে টায়ার্ড হয়ে গেছি। একটু ব্রেক দরকার।"

সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দীর্ঘশ্বাস মিথিলার দৃষ্টি এড়ায় না। বলল, "বাড়িতে নিজের বউকেও একটু টাইম দাও। নইলে বেচারি বোর হয়ে যাবে তো। আর তুমি আমাকে এত বেশী দেখলে তুমিও বোর হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে একটু ব্রেক দরকার, কি বল।"

সঞ্জয় কি বলবে ভেবে পায় না। নীরবে ড্রাইভ করতে থাকে। একসময় মিথিলাকে মিথিলার অ্যাপার্টমেন্ট"রেইনবো গার্ডেন" এ নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়।

মিথিলা ঘরে ঢুকে অমিতকে লাউঞ্জে দেখতে পেল। টিভি চলছে। মনে হয় টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ঘুম চোখে অমিত বলল, "কেমন হল তোমার নাটক? সরি দেখতে যেতে পারিনি। এত টায়ার্ড ছিলাম, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না।"

মিথিলা মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "আমার নাটক দেখতে বললই তোমার যত টায়ার্ড লাগা শুরু হয়...এ আর নতুন কি। তবে নাটক ভালই হয়েছে। সবাই খুব প্রশংসা করেছে। তোমার দিন কেমন কাটল? কতজন পেশেন্টের নাড়ী ভুঁড়ি কাটাকাটি করলে?"

মিথিলার সূক্ষ্ম খোঁচা অমিতের জন্য নতুন কিছু না। অমিত এ সবে অভ্যস্ত। হাই তুলতে তুলতে বলল, "খেয়েছ কিছু? আমি এখনও ডিনার করিনি।"

অমিতের জন্য মিথিলার মনটা একটু খারাপ হল। বলল, "তুমি এত রাত পর্যন্ত না খেয়ে আছ। আমি তো খেয়ে এসেছি। আজ সবাই এমন করে ধরেছিল যে না করতে পারিনি।"

ঘড়ি দেখে অমিত বলল, "রাত তো মাত্র এগারোটা। ভাবলাম তুমি এলে এক সাথে ডিনার করি।"

মিথিলা আর কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে বলল, "তুমি চট করে কিছু খেয়ে নাও। তারপর শোবে চল। ঘুমে তোমার চোখ লেগে আসছে। আমি একটু ফ্রেশ হয়েনি।"

মিথিলা চলে যাবার পর অমিত ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল। খেতে খেতে পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগল। একটা সময় কোন বেলার খাওয়াই কেউ কাউকে ছাড়া খাওয়া হত না। এমন কি এক প্লেট থেকে একজন আর একজনকে তুলে খাইয়ে দিত। আর এখন একসাথে খাওয়ার সময় হয় না। এর জন্যে দায়ী কে? নিজের মনেই বলল কেউ না, কেউ না। শুধু সময়ে পাল্টে দিয়েছে সব।

খাওয়া শেষ করে সব গুছিয়ে রেখে অমিত শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরে ঢুকে দেখল মিথিলা সাওয়ার থেকে বেরিয়েছে মাত্র। গায়ে ভেজা টাওয়েল জড়ানো। মিথিলা ভেজা টাওয়েল ছেড়ে একটা হোয়াইট স্লিপিং গাউন পড়ে নিল। অমিত ততক্ষণে তার বিছানার নির্ধারিত পাশে গা এলিয়ে দিয়েছে। ঘুম আগেই কেটে গিয়েছিল। একটা মেডিকেল জার্নাল নিয়ে পাতে উল্টোতে লাগল। মিথিলা আরও কিছুক্ষণ ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাটাবার পর বলল, "বাতি নিভিয়ে দেব?"

অমিত সম্মতি দিতেই বাতি নিভিয়ে মিথিলা এসে পাশে শুয়ে পড়ল। অমিত জানতে চাইল, "অমিকে দেখলাম না?"

"অমি আজ রাতে ওর এক বন্ধুর বাসায় থাকবে। কি নাকি অ্যাসাইনমেন্ট আছে? দুজনে মিলে অ্যাসাইনমেন্ট করবে।"

"ও। কার বাসায় গেছে কিছু বলে যায়নি?"

"বলেছিল। ভুলে গেছি।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে মিথিলা বলল, "ইদানীং ওর আচরণ লক্ষ্য করেছ? খুব অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে উঠে।"

"এ বয়সে সব টিনেজাররাই অল্পতে উত্তেজিত হয়ে উঠে। ও কোন ব্যতিক্রম নয়।"

"আমার মনে হয় তুমি ওকে একটু বেশী মাথায় তুলছ। যখন যা চাইছে তাই কিনে দিচ্ছ। এই কদিন আগেও ল্যাপটপ কিনে দিলে। ওর ল্যাপটপের কি দরকার?"

"না...বলল ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট করতে নাকি ল্যাপটপ লাগে তাই কিনে দিয়েছিলাম।"

"আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলেও তো পারতে।"

"কেন কিছু হয়েছে নাকি?"

"গতকাল দুপুরের খাবারের জন্য ওকে ডাকতে গেছি। দরজা খুলে দেখি ও তখন টয়লেটে। ওর ল্যাপটপ অন করা। চ্যাট করছিল। অপরিচিত মানুষের সাথে চ্যাট করে যে কি মজা পায়। আর চ্যাটের ভাষা যদি দেখতে।"

"তুমি কি মেয়ের উপর স্পাইং করছিলে নাকি?"

"স্পাইং করতে যাব কেন? ল্যাপটপে হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়েছিল।"

"কি লেখা ছিল?"

"ও যার সাথে চ্যাট করছিল সে লিখেছে, "তুমি এখন কি পড়ে আছ"? তার জানার কি দরকার আমার মেয়ে কি পড়ে আছে? আমার এ সব ভাল লাগছে না। মেয়ের কিছু হলে তুমি দায়ী।"

"তুমি এত অস্থির হয়েও না তো। অমি স্মার্ট মেয়ে। সি নোজ হাউ টু ট্যাকেল দোজ্ পারভার্টস্। ডোন্ট অরি, আমি ওর সাথে কথা বলব।"

এরপর দুজনেই চুপ। বিকেলে অরির সাথে হওয়া কথাগুলো অমিত ভাবতে লাগল। কিভাবে মিথিলার কাছে বলা যায়। এই টেনশনে অমিতের ঘাম হতে লাগল। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে বলল, "জান আজ বিকেলে অরির সাথে দেখা। অরি বলছিল..."

মিথিলা অমিতের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "অরির সাথে তো তোমার প্রতিদিনই দেখা...এ আর নতুন কি। আর ওর যত সব উদ্ভট আইডিয়া। কথাবার্তায় কোন লাগাম নেই।"

মিথিলার এই কথায় অমিত চুপসে গেল। যা বলবে ভেবেছিল তা গলার কাছে আটকে রইল। মিথিলাই আবার জিজ্ঞেস করল, "তো অরি কি বলেছিল?"

অমিত বলল, "এখন ঘুমাও...পরে বলব।"

মিথিলা আর কিছু যোগ করল না। নীরব শয়নকক্ষে দীর্ঘশ্বাস নীরবতার মাত্রা বাড়াল মাত্র। পাশ ঘোরার সময় মিথিলার নিতম্বের সাথে অমিতের হাতের ছোঁয়া লাগল। একটা সময় মিথিলা অমিতকে কাছে পাবার জন্য এই কাজটা ইচ্ছে করে করত। এটা ছিল অমিতের জন্য মিথিলার ইশারা। হরিণের রক্তের নেশায় বাঘ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে অমিতও মিথিলার নেশায় তেমন ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু এখন আর তেমনটি ঘটে না। কদাচিৎ ঘটে ঠিকই কিন্তু সেটা কোন ধরণের ইশারার মধ্যে পড়ে না। তারপরও অনেকদিন পর মিথিলার ছোঁয়া পেয়ে অমিত মুহূর্তে চরম শিহরণ অনুভব করল। অমিত মিথিলার দিকে পাশ ফিরতেই মিথিলা বলল, "আজ শরীরের উপর খুব ধকল গেছে...আমি খুব টায়ার্ড।"

অমিত আরেকবার চুপসে গেল।

৪

জীবনে অনেক বিষয় নিয়ে ছোট বড় অনেক জটিলতা থাকলেও ঘুম নিয়ে জটিলতা নেই ইন্সপেক্টর আলম খানের। যত সমস্যাই থাকুক বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ার অসাধারণ গুন তার আছে। রাত বেশী

জাগার অভ্যাস নেই। চেষ্টা করে দ্রুতই বিছানায় শুয়ে পড়তে। কোন ধরণের ব্যতিক্রম না ঘটলে সাধারণত সকালে ছটা সাড়ে ছটার মধ্যেই ঘুম ভাঙ্গে। আজ ব্যতিক্রম হল। আলম খান নির্ধারিত সময়ের অনেক জেগে উঠল। স্বপ্নের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ঘুমের মধ্যেই ঘেমে ভিজে উঠল। অস্বস্তি কাটাতে বিছানায় উঠে বসলেন। সামনের দেওয়ালে ঝোলানো দেওয়াল ঘড়িতে দেখলেন পাঁচটা পাঁচ। বেড সাইড টেবিলের উপর রাখা মোবাইলের সাথে সময় মিলিয়ে দেখল, সময় আসলেই তাই।

আলম খান ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নে সাধারণত বিচলিত বোধ করে না। বেশীর ভাগ স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গার পর মনেও করতে পারে না। কিন্তু আজকের দেখা স্বপ্নে ঘুম ভাঙ্গার পরও মনের মাঝে একটা চাপা অস্বস্তি অনুভব করল। স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা হতে পারে কিছু ভেবে পেল না। স্বপ্নে দেখল পুলিশের কালো তালিকাভুক্ত "রেপ" কেসের আসামী "কালা মিলন" কে। বাস্তবে একবারই দেখা হয়েছিল। দুবছর আগে। ঢাকা থেকে তাড়া করতে করতে শেষমেশ গাজীপুরে আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল কালা মিলনকে গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারের পর রাতারাতি "সেলিব্রেটি" বনে গিয়েছিল ইন্সপেক্টর আলম খান। থানার বাইরে পত্রিকাওয়ালাদের লাইন পড়ে গিয়েছিল। "দৈনিক অর্থহীন" এর শিরোনামে ছিল "আমাদের সুপার হিরো, ইন্সপেক্টর আলম"। সাথে সুপারম্যানের বডির সাথে ইন্সপেক্টর আলমের মুখ বসানো কার্টুন। শৈশবের আইডলের সাথে তুলনা করায় ইন্সপেক্টর আলম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল তবে ভাবে প্রকাশ করেনি।

স্বপ্নে দেখল কালা মিলন ধারালো চাপাতি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে আর বনের মতো একটা জায়গার ভেতর দিয়ে ইন্সপেক্টর আলম দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। ভয় পেলে দ্রুত শক্তি ফুরিয়ে আসতে থাকে, ইন্সপেক্টর আলমের গতি কমে আসতে লাগল। প্রাণপণে গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল। যত চেষ্টা করল আর ততই ঘেমে উঠল। দৌড়তে দৌড়তে দুপাশের গাছের দিকে চোখ পড়তেই ইন্সপেক্টর আলমের দেহ হিম হয়ে এলো। দেখলেন দুপাশে উঁচু উঁচু পাইন গাছ, কোনটার ডালে পাতা নেই। পাতার বদলে ঝুলছে যন্ত্রণা কাতর নগ্ন নারীর দেহ। বেশীর ভাগ দেহই রক্ত শূন্য, মৃত। কারো কারো দেহ থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠে সাহায্যের আকুতি। ইন্সপেক্টর আলম পিছনে তাকাতেই দেখল কালা মিলন হাসছে। এমনিতেই কালা মিলন দেখতে ভয়ঙ্কর, হাসিতে ইন্সপেক্টর আলমের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ইন্সপেক্টর আলম সামনে ফিরতেই সামনের পাইন গাছটায় আছাড় খেল। উপরে তাকিয়ে দেখলেন এ গাছের সাথে তার মমতাময়ী মাতা রেহানা খানকে। রেহানা খান পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই সামান্য একটা ক্রিমিনালকে থামাতে পারলি নারে বাবা।" আর তখনি তীক্ষ্ণ একটা কিছু ইন্সপেক্টর আলমের পিঠে আঘাত হানল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল। সাথে সাথে ঘুম কেটে গিয়েছিল।

কালা মিলনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল। মাসখানেক আগে শুনেছিল কালা মিলন পালিয়েছে। এত লোকের চোখকে কি করে ফাকি দেওয়া সম্ভব ইন্সপেক্টর আলম ভেবে পায়নি। টিভিতে একবার ম্যাজিশিয়ান ডেভিড কপারফিল্ডের ট্রেনের বগি ভ্যানিশ করে দেওয়ার ম্যাজিক দেখেছিল। দারুণ ম্যাজিক। এত লোকের সামনে এত বিশাল একটা ট্রেনের বগি নাই করে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ইন্সপেক্টর আলম দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। ম্যাজিশিয়ানদের কাজই তো সব উধাও করে দেওয়া। আবার ফিরিয়ে এনে দর্শককে আনন্দ দেওয়া। কালা মিলন উধাও হয়ে বাড়িয়েছে অশান্তি। কালা মিলন তো ম্যাজিশিয়ান না তাহলে নিজেকে উধাও করে দিল কিভাবে, তবে কি কালা মিলনও ম্যাজিক জানে? একজন রেপিস্ট ম্যাজিশিয়ান হলে তো খুবই চিন্তার কথা। ইন্সপেক্টর আলম মনে মনে বলল, "ব্যাটা এখনও উৎপাত শুরু করেনি তবে সতর্ক থাকতে হবে।"

আলম খান উঠে বসে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। চিরচেনা শোবার ঘর। পাশে সালমা ঘুমিয়ে আছে। শিশুদের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। মাঝে মাঝে গভীর নিশ্বাস ফেলছে। সালমার ঘুম গাঢ়। এই সাতসকালে ভূমিকম্প না হলে ঘুম ভাঙ্গবে না। সালমা দুবার ভ্রু কুঁচকালো। স্বপ্ন দেখছে নাকি? ইন্সপেক্টর আলম তাকিয়ে রইল।

পর্দার ফাঁক গলে ফিনকি দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে এসে পড়ছে। সালমার গায়ে কাঁথা নেমে গিয়েছিল। কাঁথা উঠিয়ে দিয়ে বেডরুমের সাথে লাগোয়া বারান্দায় এসে বসল। ভোরের সোনালী আলো চারদিকে যেন আছড়ে পড়ছে। যে ঢাকা শহর নিয়ে সবাই এত অভিযোগ করে "প্যানডোরা" অ্যাপার্টমেন্টের পনেরো তলা থেকে ইন্সপেক্টর আলমের তা অসাধারণ লাগল। এত মনোরম বিশ্রামের জায়গা তার শয়নকক্ষের সাথে লাগানো আর তিনি তা কখনও লক্ষ্যই করেনি। আলম নিজের উপর হাল্কা বিরক্ত হল। তবে মনের অস্বস্তি কাটতে শুরু করেছে। মনে মনে বলল, "ভাল লক্ষণ।" ঠিক করল এখন থেকে বারান্দায় প্রতিদিন কিছু সময় কাটাবে।

কলিং বেলের শব্দে আলম খানের ধ্যান ভাঙ্গল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছটা। কাজের বুয়া এই সময় আসে। উঠতে ইচ্ছে না করছিল না তাও উঠতে বাধ্য হল। নইলে সালমাকে উঠতে হবে। আলম খান দরজা খুলে দিল। দেখল কাজের বুয়া এসেছে। কাজের বুয়াকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে আলম হাত মুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল সালমা ঘুম জড়ানো চোখে আলমের দিকে তাকিয়ে আছে। আলম বলল, "কি দেখ?" সালমা কিছু বলল না। মুখটা খুশি খুশি। চোখ কচলাতে কচলাতে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকল।

অফিসে যাবার পোশাক পড়ে তৈরি হয়ে নিল আলম। নাস্তার টেবিলে বসতে সালমাও এসে যোগ দিল আলমের সাথে। অনেকদিন একসাথে সকালের নাস্তা করা হয়নি। নাস্তার টেবিলে সালমাকে দেখে আলমের মন ভাল হওয়া আরো বাড়ল।

"অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়না। চল না কোথাও থেকে বেরিয়ে আসি?" খেতে খেতে সালমা বলল।

"বেড়াতে যেতে তো আমিও চাই, কিন্তু কি করব বলো, কাজের অনেক প্রেশার। দেখনা উইক এন্ডে মাঝে মাঝে ক্রিমিনাল ধরতে বাইরে কাটাতে হয়। হলিডেতে যাওয়ার সময় কোথায়?"

"তোমার সময়ই নেই আর আমার কত সময়।"

"বিয়ের আগে তো তুমি খুব আঁকা আঁকি করতে। বিয়ের পরও অনেকদিন কন্টিনিউ করে ছিলে। আবার শুরু করলেই তো পার।"

"আচ্ছা আমাদের বিয়ের তো অনেকদিন হল!"

"তো?" কথার ভাব বুঝতে না পেরে আলম খানের কপালে ভাঁজ দেখা দিল।

"ভাবছিলাম একটা বেবি নিলে কেমন হয়? এখনতো আমি কিছু করছিনা। বাচ্চা দেখে সময়টা দারুণ কেটে যেত।"

"বেবি? এখন?"

"কেন? কোন সমস্যা?"

"না বলছিলাম, আর কদিন অপেক্ষা করা যায় না।"

"লাস্ট দু বছর হল তো এই কথা শুনছি। আর কত?"

"আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে আসি তারপর আবার কথা হবে। ভাল থেকো।" যাবার সময় ইন্সপেক্টর আলম সালমার গালের সাথে গাল ছুঁয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

সালমা অন্যদিনগুলোর মতো একাই সকালের নাস্তা শেষ করল। সালমা ভেবে পায়না, তার স্বামীর কথা শুনলে নাকি "ক্রিমিনাল" ভয়ে কাঁপে আর সেই মানুষটা বাচ্চা কাচ্চার নাম শুনলে কেন এভাবে

ক্রিমিনালের মতো পালিয়ে বেড়ায়। মানুষের কি বাচ্চা কাচ্চা হবে না তাই বলে কি এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে নাকি? আশা ভঙ্গের বেদনায় সালমা কিছুটা ক্রুদ্ধ হল।

একটা সময় স্বামীর মুখ থেকে না শুনলেই চোখ ভিজে উঠত। ইদানীং চোখ ভেজে না তবে হতাশ লাগে। আর কদিন পর হয় তো তাও লাগবে না। যতই দিন যাচ্ছে পরিবর্তন যেন ততই দ্রুত ঘটছে। সালমা ভাবে এর জন্যই হয়তো লোকে বলে "অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর"। পাথর হতে আর কদিন বাকী আছে কে জানে। তখন যদি বাচ্চা হয় তাও হবে পাথর। পাথরের পেট থেকে তো মানুষ জন্মাবে না। সালমার হঠাৎ হাসি পেল। খিলখিল করে হেসে উঠল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ ভাবনায় মগ্ন ছিল। টেবিল থেকে চোখ উপরে তুলতেই দেখল টেবিলের ওপাশে বাড়ি কাজের বুয়া সালমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাসতে দেখে বুয়া জিজ্ঞেস করল, "কি আপা, একা একা হাসতাছেন ক্যা?"

মুখে হাসি ধরে রেখে সালমা জবাব দিল, "পাথর হয়ে গেলে তো আর হাসতে পারব না। তাই যতদিন মানুষ আছি একটু হেসে নিচ্ছি।"

"আফা, এইসব কি কইতাছেন? কিছুই বুঝি না। আফার কি শরীর খারাপ? মাথা টিপা দিমু?"

"আমি ঠিক আছি বুয়া। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এমনি একটু মজা করলাম তোমার সাথে।" খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সালমা। "আমি শোবার ঘরে যাচ্ছি। তোমার কাজ শেষে গত মাসের বেতন নিয়ে যেও।"

"জি আফা।"

সালমার জীবনে গতির কোন কমতি ছিল না। স্কুলের চাকরিতে নিজ দক্ষতার গুনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্টুডেন্ট আর টিচারদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চাকরিতে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যে বড়মামা বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন। ছেলে পুলিশে চাকরি করে। সাব ইন্সপেক্টর। মামা বলতেন পুলিশের ভয়ে নাকি বাঘে কুমিরে একঘাটে জল খায় আর তার সাথে বিয়ে, কোন সহজ কথা নয়। মামার অতি উৎসাহের কারণ ছিল ছেলের পরিবার। মা ছেলের বয়স নিয়ে একটু বেঁকে বসেছিলেন। আট বছরের ব্যবধান। এ যুগে এত ব্যবধানে কারো বিয়ে হয় নাকি। মামা বলেছিলেন ছেলে বয়স কম হল কিন্তু যদি ছেলে ভাল না হয় সেটা কি ভাল হবে।

মা মামা"র কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী না হয়ে পারেননি। বিয়ে হল। তার কিছুদিন পর সালমা মা হতে চলল। সবার মনে বিশেষ করে আলমের মনে কি উত্তেজনা। দুজনে মিলে কত জল্পনা কল্পনা করত বাচ্চার ঘর কিভাবে সাজাবে, কি কি কিনতে হবে। নতুন এক স্বপ্নে হারিয়ে গিয়েছিল দুজনে। ডাক্তার বলেছিল এ সময়টা যতটা কর্মঠ থাকা যায়। তাই স্কুলের চাকরীটা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছিল।

ডেলিভারির তখন আর হপ্তা দুয়েক বাকী। আর একদিন পর থেকেই ম্যাটারনিটি লিভ শুরু হত। সকালে স্কুলে যাবার আগে আলম বলেছিল - "স্কুলে যেতেই হবে? ফোন করে জানিয়ে দাও না।"

সালমা উত্তরে বলেছিল, "আজই শেষ তো। তারপর তো ঘরেই থাকব। আর গেলে তো ভালই লাগে। সবাই কত আগ্রহ করে কত কথা জানতে চাই। তুমি চিন্তা করো না। আমি যাব, সবার সাথে দেখা করে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে আসব।"

"আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি?"

"তুমি শুধু শুধু চিন্তা করো নাতো। আমি যাব আর আসব।"

সালমা স্কুলে যাবার জন্য রওনা দিয়েছিল। ট্রাফিক সিগন্যালে আর সবার সাথে অপেক্ষা করছিল বাতি সবুজ থেকে লাল হবার। একসময় লাল হল। সবাই দ্রুত পার হয়ে গেল। শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া আগের মতো আর দ্রুত হাঁটতে পারছিল না সালমা। পথের মাঝ বরাবর আসতে হঠাৎ কোত্থেকে সিগন্যাল অমান্য করে একটা মিশুক সোজা সালমাকে আঘাত করল। সালমা ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারাল। সালমার মনে হয়েছিল জ্ঞান হারাবার আগ মুহূর্তে পেটের বাচ্চাটা যেন আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে 'মা' বলে চিৎকার করে উঠে চিরতরে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করে সালমাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। বাচ্চা হারানোর শোক সালমাকে বিষণ্ণতার গভীর সাগরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল বছর খানেকের মাঝে আর মা হবার চেষ্টা না করতে। দুর্বল ইউটেরাসে কনসিভ করতে গেলে মা শিশুর দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। তাই সময় নিতে বলেছিল। সালমাকে হারানোর ভয়ে আলমও বাচ্চা কাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে কোন কথা তুলত না।

এখন সালমার দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে কম্পিউটারের মনিটরের সামনে। "চ্যাট" করে। একটা সময় অন্যদের "চ্যাট" করতে দেখলে বিরক্ত হত। মনে হত যাদের কাজের অভাব তারাই পারে এভাবে সময় অপচয় করতে। আর এখন নিজের সময় কাটে পরিচিত অপরিচিত দেশ বিদেশের মানুষের সাথে কি বোর্ডের বোতাম চেপে।

৫

"স্যার, আপনার সাথে একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।"

"কি নাম?"

"বললেন মিস্টার আর মিসেস রায়হান।"

ইন্সপেক্টর আলমের ভ্রু কিছুটা কুঞ্চিত হল। এই নামের কোন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বা তাদের কোন আত্মীয় স্বজনের নাম মনে করতে পারলেন না। এতে মনে মনে বরং খুশিই হলেন। কোন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী হলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হত। কৃতজ্ঞতা বোধ বলতে কোন বোধ এদের অভিধানে নেই বরং নিজেদের যোগ্যতা জাহির করতে প্রতি পদে পদে অন্যকে ছোট করতে ওস্তাদ। এদের সমস্যা যেমন বিচিত্র সমাধানও তেমন বিচিত্র হয়।

"কি ব্যাপার? কেন দেখা করতে চায়?"

"মনে হয় "মিসিং কেস"?"

"আচ্ছা ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও।"

অমিত প্রথমে ঢুকল তারপর মিথিলা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি অমিত রায়হান আর আমার স্ত্রী মিথিলা রায়হান।"

"আমি আলম খান। প্লিজ বসুন।"

"মিথিলা রায়হান নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে।" একটু ভেবে নিয়ে আলম বলল, "ও মনে পড়েছে। আপনি মঞ্চে নাটক করেন তাই না।"

মিথিলা উত্তরে শুধু একটু মাথা ঝাঁকাল।

"একবার মহিলা সমিতিতে আপনাদের দলের নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দারুণ অভিনয় করেছিলেন।"

মিথিলা বা অমিত কারো ইচ্ছে নেই নাটক বা অভিনয় নিয়ে এখন কথা বাড়ানোর। ভদ্রতার খাতিরে মিথিলা মৃদু কণ্ঠে শুধু বলল, "থ্যাংক ইউ।"

"তা বলুন কি করতে পারি আপনাদের জন্য?"

আলমের কথায় ঘরের মধ্যে নীরবতা তৈরি হল। মিথিলা ও অমিত ইতস্তত করতে লাগল। যেন ঘটনার ভয়াবহতায় দুজনের কেউই কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। মিথিলা অমিতের দিকে তাকিয়ে যেন মনে

মনে অনুরোধ করল কথা বলার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমিত শুরু করল, "আমাদের মেয়ে অমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল বিকেলে এক বন্ধুর বাসায় যাবে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। বলেছিল রাতে সেখানে থাকবে। দুজনে মিলে স্কুলের অ্যাসাইনমেন্ট করবে। আজ সকালে ক্লাস করে বিকেলে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু ও ওর বন্ধুর বাড়ি যায়নি।"

একটু থেমে আবার শুরু করল অমিত, "ওর বন্ধু সকালে বাসায় ফোন করেছিল। বলল অমি নাকি রাতে ওদের বাড়ি যায়নি। ওকে মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না। আমরাও অনেকবার চেষ্টা করেছি। কোন লাভ হয়নি। ওর সব বন্ধুদের বাসায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে। আত্মীয় স্বজনের বাসাও খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কেউ ওর কোন খবর বলতে পারেনি।" আবার একটু থেমে অমিত বলল, "হসপিটালগুলোতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে।"

আলম সব শুনে জানতে চাইল, "অমির বয়স কত?"

"আসছে সেপ্টেম্বরে আঠারো হবে।" অমিত উত্তর দিল।

"মেয়ের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?"

"ভাল। বন্ধুর মতো।" অমিত আর মিথিলা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল।

"সব বাবা মা"ই তা বলেন।" আলম বলল। "রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল এমন কখনও হয়েছে?"

"না।"

"রিসেন্টলি কি ওর মাঝে চোখে পড়ার মতো কোন "চেঞ্জ" লক্ষ্য করেছিলেন? যেমন অহেতুক রেগে যাওয়া অথবা খাওয়া দাওয়ায় অনীহা।"

"নাতো...তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যেমন হয় অমিও তাই ছিল। পরিবর্তনগুলো নাথিং সিরিয়াস।"

"সব কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায়। আচ্ছা ওর কি কোন বয়ফ্রেন্ড আছে?"

অমিত আর মিথিলা আবার দুজনে দুজনের দিকে তাকালো। মিথিলা বলল, "জানি না।"

"ওর যেসব বন্ধুদের নাম ঠিকানা আপনারা জানেন এমন কি হতে পারে না তার বাইরেও ওর আরও বন্ধু আছে যাদের নাম ঠিকানা আপনাদের জানা নেই আর অমি তেমন কারোই বাড়িতে গেছে।"

"হতে পারে। কিন্তু ওকে তো মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না"

"হয়তো মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গেছে।"

আগের কথার রেশ ধরে ইন্সপেক্টর আলম বলল, "এমন কি হতে পারে না আপনাদের মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছিল না তাই বয়ফ্রেন্ডের সাথে কোথাও যে লুকিয়ে আছে। আপনাদের একটু বাজিয়ে দেখছে। পরিবেশ শান্ত হলে আবার হাজির হবে।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন? মেয়ে আমার কারো হাত ধরে পালিয়ে গেছে আর আমরা আপনাকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে এসেছি?"

"দেখুন মিসেস রায়হান, সন্তানের বাব মা হিসেবে সন্তানের বিপদে আপদে যুক্তির চেয়ে বাবা মা"র আবেগের মাত্রা বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কাজের ধরণটাই এমন যে সব যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হয়। আমি তাই সম্ভাবনার কথা বলছিলাম আর কি।"

একটু থেমে আলম আবার প্রশ্ন করল, "অমিকে কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বললেন যেন?"

"গতকাল বিকেলে ওর সাথে আমাদের মানে ওর মা"র সাথে শেষ দেখা হয়েছিল।"

"গতকাল বিকেলে... তার মানে তো এখনও চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি। এত অল্প সময়ের জন্যে কেউ "আনট্রেসেবল" থাকতে পারে তাই বলে তো তাকে নিখোঁজ বলা যায় না। পুলিশের আইনে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা নিখোঁজ না হলে আমরা তাকে নিখোঁজ বলতে পারি না। আর আপনাদের মেয়ের বয়স এখনও আঠারো হতে না পারে কিন্তু ভাল মন্দ বোঝার বয়স তার হয়েছে। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা অ্যাডভেঞ্চার করতে পছন্দ করে। হারিয়ে যায় আবার ফিরে এসে সবাইকে চমকে দিয়ে এরা মজা করে। আমার মনে হয় এটাও তাই।"

"যদি কিছু মনে না করেন একটা সাজেশন দিই। এখন বাড়ি যান। অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আশাকরি আপনাদের আর থানা পথ মাড়াতে হবে না এবং এই সময়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের মেয়ের খোঁজ পেয়ে যাবেন।"

মিথিলা অমিতের দিকে তাকালো। চোখে মুখে বিরক্তির ছায়া। আরেকটু বেশী সহানুভূতি আশা করে ছিল। অমিত আর মিথিলা অনিচ্ছা স্বত্বেও উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে পৌঁছতেই আলম বলল, "মিস্টার রায়হান, আপনারা বরং আপনাদের মেয়ের ডিটেলস্ দিয়ে যান। আমরা যদি কোন খোঁজ পাই তাহলে আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করবে। তবে আশাকরি আমাদের কাছ থেকে আপনাদের কিছু শুনতে হবে না।" এই বলে একটা মিসিং পার্সন আইডেন্টিফিকেশন ফর্ম অমিতের দিকে এগিয়ে দিল।

_"থ্যাংক ইউ" - বলল অমিত। তারপর অমির ডিটেলস্ লিখে দিল।

৬

অমি চোখ মেলার চেষ্টা করল। ঝাপসা দৃষ্টি। দৃষ্টি স্বাভাবিক হতে কিছু মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। ড্রাগের প্রভাব এখনও কাটেনি। তবে প্রভাব ফিকে হতে শুরু করেছে।

দৃষ্টি স্বাভাবিক হতে চারপাশ দেখার চেষ্টা করল। পরিচিত কোন জায়গার সাথে মেলাতে পারল না। ঘরে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু একটা তোষক পাতা। তার উপর এতক্ষণ অমি উপর হয়ে অচেতন ছিল। পায়ের কাছে মেঝেতে ট্রাইপডের উপর ভিডিও ক্যামেরা দেখতে পেল। মস্তিষ্ক এখনো পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে উঠেনি। তাই প্রায় ফাঁকা ঘরে ভিডিও ক্যামেরা কেন তা ভেবে পেল না। মাথার উপর ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানটা কট কট শব্দ করে উঠল। অমির মনে হল কানের কাছে কেউ যেন গ্রেনেড ফাটাল। শব্দের তীব্রতায় চোখ বুজে এলো।

মস্তিষ্কে শব্দের তীব্রতা কমে এলে অমি আবার চোখ মেলল। ঘরের আরেকপাশটা দেখার জন্য মাথা ঘোরানোর চেষ্টা করতেই মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। তবে হাল ছাড়ল না। অল্প অল্প করে ঘোরাতে সক্ষম হল। দেখল দুটো দরজা। একটা বন্ধ অন্যটা খোলা। খোলাটা দিয়ে ঘরে আলো এসে ঢুকছে। দরজার ফাঁক দিয়ে রেলিং দেখা যায়। বুঝল ওটা বারান্দা।

সবশেষে নিজের দিকে চোখ বুলাল। বুঝল হাত পেছনে বাঁধা। দেহ বস্ত্রহীন। কখন কি ভাবে কি ঘটে গেছে কিছু মনে করতে পারল না। বুঝল পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। ভয়ে গাঁয়ে কাঁটা দিল। উত্তেজনার কারণে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পেল।

এখানে এলো কি করে অমি তা ভাবতে চেষ্টা করল। মনে পরল নুবিরার বাসায় অ্যাসাইনমেন্ট করতে যাবার কথা ছিল। মা"র কাছে টাকা চেয়েছিল তারপর মনন এর জন্য ব্লু বেরীতে অপেক্ষা করছিল তখন জিসানের সাথে দেখা। জিসান ফিস ফিস করে কানের কাছে কি যেন বলেছিল তারপর থেকে আর কিছু মনে নেই।

ভয়ে অমির চোখ ভিজে উঠল। গলা শুকিয়ে এলো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠল। অমির বাবা মা"র জন্য অমির খুব দুঃখ হল। আবার ভয়ও হল। বাড়ি ফিরতে পারলে নিশ্চয়ই মা খুব বকবে। নুবিরাটা এখন কি করছে, কে জানে? হয়তো একাই

অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে ক্লাসে জমাও দিয়ে দিয়েছে। আর মনন, বেচারা মনন। কত স্বপ্ন ছিল ওর মনে। বলেছিল পড়া শেষ হলে নাকি হিমালয় অভিযানে বের হবে। অমিকে সাথে নেবার জন্য তার কত অনুরোধ। অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমির দেহ ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

অমির চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, তোমারা কে কোথায় আছ, প্লিজ আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এখানে ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মা আমি আর তোমার অবাধ্য হব না। যা বলবে তাই শুনব। বাবা তোমার কাছে আর অন্যায় আবদার করব না। তোমরা যা চাইবে এখন থেকে আমি তাই করব।

নুবিরা তোকে কোন পোষ্টার দিতে হবে না। তুই চাইলে আমার সব পোষ্টার আমি তোকে দিয়ে দিব। শুধু একবার আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা।

মনন হিমালয় কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তে তুমি যেতে চাও আমি তোমার সাথী হব। তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। অপেক্ষা করার দায়িত্ব এখন থেকে আমার। শুধু একটিবার তুমি যদি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতে।

অমির মনের নীরব আকুতি কারো কাছে পৌঁছায় না। পছন্দের মানুষগুলোর স্মৃতি শুধু মনে ঘুর পাক খায়। এই মহাবিপদে একটু সান্ত্বনা।

বন্ধ দরজা খোলার শব্দ পেলে অমি। ভেতরে ঢুকে জিসান দরজা বন্ধ করে দিল যাতে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে। জিসানের হাতে একটা খাবারের ট্রে। খাবারের প্লেটটা অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। অমিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিসানের কঠিন মুখে হাসি ফুটল। বলল, "তুমি তো দারুণ ঘুমাতে পারো। আমি তোমার খাবার নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছি। এখন উঠ তো। একটু কিছু মুখে দেবে।" জিসান এমন ভাবে কথাগুলো বলে গেল যেন কিছুই হয়নি।

জিসানের উপস্থিতিতে অমির মনে ভয় ও সংশয় দেখা দিল। অমি বলল, "আমি এখানে কি করে এলাম? আর আমার এ অবস্থা হল কি করে?"

অমির মাথার কাছে ট্রে রাখতে রাখতে জিসান বলল, "এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে। তুমি আর আমি ক্লু বেরীতে দেখা করলাম। তুমি বললে তোমার মাথা ঘুরছে আর তখন আমি তোমাকে নিয়ে এলাম। বুঝতে পেরেছি ওইবার ডোজটা একটু বেশী পড়ে গিয়েছিল তাই সব ভুলে বসে আছ। কথা দিচ্ছি এবারেরটা ঠিক মতো দেব।"

জিসান অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনাটা সরালো। প্লেটে সাদা তরলে ভর্তি একটা সিরিঞ্জ। অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনাটা সরিয়ে রেখে বলল, "এবার তোমার জন্য ম্যাজিক নিয়ে এসেছি। এর নাম ম্যাজিক কারণ কি বলতো?"

সিরিঞ্জ দেখে অমির মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যেতে লাগল। জিসান অমির উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, "এই জিনিস ম্যাজিকের মতো মানুষের সব ক্লান্তি, দুঃখ বেদনা, অশান্তি দূর করে দেয়। ইউ উইল বি অন দি টপ অফ দি ওয়ার্ল্ড। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? শান্ত হয়ে বসো। এখনি বুঝতে পারবে।"

জিসান অমির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে অমিকে সোজা করে বসালো। ড্রাগের প্রভাব, ভয় আর ক্ষুধায় অমির দেহ ক্লান্ত। প্রতিরোধের শক্তি নেই। অমির অবস্থা কাপড়ের দোকানে সাজিয়ে রাখা পুতুলের মতো। নিজের কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কথা নেই। দোকানী যেভাবে চাইবে পুতুলকেও সেভাবে থাকতে হবে। সোজা করে রাখলে সোজা, বাঁকা করে রাখলে বাঁকা।

সিরিঞ্জ হাতে জিসান প্রস্তুত। ঠিক তখনি জিসানকে অবাক করে দিয়ে পুতুলের মতো বসিয়ে রাখা অমি মানুষের মতো নড়ে উঠল। অমির দেহে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে জিসানের ডান হাতের সিরিঞ্জ ধরে বা হাতের তালুতে বসিয়ে দিল। জিসান ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। এই সুযোগে অমি বারান্দার দিকে ছুটে গেল। যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এত মানুষের এই শহরে কেউ না কেউ নিশ্চয় এগিয়ে আসবে।

জিসান অমির পেছন পেছন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জিসানের মুখ ইস্পাতের মতো কঠিন। সিরিঞ্জের খোঁচায় বা হাতের তালু থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। শিকারির সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। শিকারের শক্তি নিঃশেষ হওয়া মাত্রই শিকারির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে অমির অস্থির ছুটাছুটি দেখতে লাগল জিসান।

রেলিংয়ের কাছে পৌঁছে অমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিচে হেঁটে যাওয়া অগণিত মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। কিন্তু এত উপর থেকে অমির আবেদন ব্যস্ত ঢাকা শহরের কারো কানে পৌঁছল না। অমির বৃথা চেষ্টা দেখে জিসান ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি শুধু শুধু তোমার কষ্ট বাড়াচ্ছ। এর চেয়ে অনেক সহজে তোমার কষ্ট দূর করতে পারতে।"

জিসান অমিকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। জিসানের হাত থেকে বাঁচার জন্য অমি বারান্দার রেলিংয়ের ওপাশে শূন্যে শরীর বাঁকালো। শরীর একটু বেশী বেঁকে গিয়েছিল। সামলাতে না পেরে ঝরে পড়া পাতার মতো অমির দেহ শূন্যে ভেসে উঠল। শূন্যে ভেসে উঠার আগে জিসানের হাত অমির হাত স্পর্শ করেছিল ঠিকই কিন্তু সামলে উঠার আগেই অমির দেহ পৃথিবীর আকর্ষণে নিচে নেমে গেল।

"এইটা কি দিলেন স্যার?"

"কেন? ভাড়া তো এটাই ঠিক হইছিল।"

"ভাড়া তো ঠিক হইছিল ওই গলির মুখ পর্যন্ত। এতখানি ভেতরে আইবেন হেইটা তো কন নাই।"

"গলির মুখ থেকে এইটুক আইছ মিয়া। তার জন্য ভাড়া নিয়া তর্ক কর।"

"তাইলে হাঁইটা আইলেন তো পারতেন। অহন ভাড়া দেন।"

"ভাড়া দেই নাই নাকি? যেটা দিলাম সেটা নেও না ক্যান?"

"বেশী আইছেন...ভাড়া বাড়াইয়া দেওন লাগব। টাইম নষ্ট হইতাছে। টাইমের মেলা দাম।"

"কিরে শালার পো শালা টাইম নিয়া আমারে লেকচার দেস?"

"ভাড়া দিবেন না...তো গালাগালি করেন ক্যান? আপনেগো সম্মান আছে আমাগো সম্মান নাই?

প্রচণ্ড জোরে উপর থেকে নিচে কিছু পড়ার শব্দে ভাড়া নিয়ে বিতর্কে ছেদ পড়ল। রিকশাওয়ালা আর আরোহীর দৃষ্টি শব্দের উৎসের দিকে পড়তেই দুজনের শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো। দুজনেই নির্বাক। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন যা দেখি তা ভুল দেখি না তো। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালো। প্রশ্নের মতো উত্তরটাও নির্বাক। ভুল না যা দেখছে তা ঠিকই দেখছে। রিকশাওয়ালা আর আরোহীর থেকে মাত্র শ"দেড়েক ফুট দূরে একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে। মাটিতে সরাসরি আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে এসেছে। রক্তের যেন বন্যা বইছে। মুহূর্তে দেহের চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। বীভৎস দৃশ্য।

৭

থানা থেকে ফিরে অমিতের আর হসপিটাল যেতে মন চাইল না। সকালে মিথিলার ফোন পেয়ে হসপিটাল থেকে আসার আগে জুনিয়র ডক্টরদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে এসেছিল। ওরা সামলে নিতে

পারব। অমিতের সে বিশ্বাস আছে। ইদানীং কাজের প্রতি অনীহা জন্মাতে শুরু করেছে। একটা সময় নিজের শিফট পর অন্যদের শিফটেও প্রক্সি দিতে সমস্যা হত না। এখন নিজের শিফট শেষ করতেই অস্থির লাগে। অমিত ভাবে তবে কি জীবন দ্রুত ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে? এক জায়গায় অনীহা জন্মালে তা জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে। আস্তে আস্তে অনীহা নামক "ব্ল্যাক হোল" জীবনটাকে গ্রাস করে নেবে। হয়তো অরির কথাই ঠিক। মাথা জ্যাম হয়ে আছে এবং তার সাইড এফেক্ট হচ্ছে অনীহা।

অমি হঠাৎ হারিয়ে গিয়ে যেন অমিত আর মিথিলার মধ্যে দূরত্ব কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছে। দুপুরের খাবার খেতে বসে অমিতের তাই মনে হল। শেষ কবে যে দুজনে একসাথে দুপুরের অথবা রাতের খাবার খেয়েছিল অমিত অনেক চেষ্টা করেও তা মনে করতে পারল না। অমিতকে ভাবতে দেখে গোল কাচের টেবিলের ও পাশ থেকে মিথিলা একবার জানতে চাইল, "কি ভাবছ?"

"না তেমন কিছু না...ভাবছি মেয়েটার কি হল?"

"তুমি কি আবার হসপিটাল যাবে?"

"না আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না।" কথা বার্তা তেমন একটা এগুলো না। অমিত আবার খাওয়া শুরু করল। মোটামুটি নীরবেই দুজনে খেয়ে গেল।

তবে অমিতের মাথার ভেতর ভাবনাগুলো ঘুরতে লাগল। দূরত্ব...কিসের দূরত্ব? সংসার নামক জীবনমুখী গান তো ঠিক ঠাক মতোই চলছিল। "ডিসপ্লে হোম" গুলোর মতো সাজানো এই সংসারে কখন, কোথায়, কেন যে ছন্দপতন ঘটেছে অমিত বুঝতে পারে না। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নাই। দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীর মতোই দুজনে গোছানো দাম্পত্য জীবনের অভিনয়ে ব্যস্ত। কারো অভিনয়ে কোন ত্রুটি নেই।

অমিত দুজনের একসাথে কাটানো সময়গুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। অমিত ভাবে মিথিলার কোন কাজে কখনও সে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অহেতুক স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর কখনো কর্তৃত্ব ফলায়নি। তাহলে দূরত্ব তৈরি হবে কেন? প্রাচুর্যের তো কোন অভাব ছিল না তারপরও মিথিলা কেন সুখী হতে পারল না...অমিত কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

মিথিলা খাওয়া শেষ করে বেশ কটা নাম্বারে ফোন করল। যদি মেয়েটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়। তবে কোন লাভ হল না। সব জায়গা থেকে এক উত্তর। "না অমি আসেনি।" এক উত্তর শুনে মিথিলার উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। অমিতের ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুটা বিরক্ত হল। মনে মনে বলল তুমি আর কত নির্লিপ্ত থাকবে...আমাদের জন্য কি তোমার মনে একটুও অস্থির লাগে না? অমিতের নীরবতায় মিথিলার অস্থিরতা আরো বাড়ে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে।

আবেগ প্রকাশে অমিত বড়ই কৃপণ, মিথিলার তা অজানা নয়। আবেগ দমনে সিদ্ধ হস্ত। হয়তো পেশাগত কারণে অমিত নিজেকে শত উত্তেজনায় স্থির রাখতে পারে। নইলে হয়তো অপারেশন থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষারত রোগীর শুভাকাংখীদের সাথে আবেগ প্রকাশের প্রতিযোগিতায় নামতে হত।

বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর মিথিলা অমিতের কাছে প্রায়ই অনুযোগের সুরে বলত, "তুমি খুব মুখচোরা...মুখ ফুটে কিছু বলতে তোমার এত সংকোচ কেন? এমনি মুখ বুজে থাক আর যখন মুখ খোল তখন শুধু অভিযোগ। আমি এটা করিনি...ওটা করিনি...কেন সবাই পারে আমি কেন পারি না।

অমিত বলত, "কি যে বল না, অভিযোগ করতে যাব কেন? এটা তো হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক। মিথ্যে করে ভাল বলল কি তোমার শুনতে ভাল লাগত?" মিথ্যে করে বললে মিথিলার ভাল লাগত না তারপরও মিথিলা যেন যুদ্ধে জেতার জন্য বলত, "মুখ খুলে তো একটু ভাল কিছুও বলা যায়। যা পারিনি সেটা না বলে যা পেরেছি সেটাও তো বলা যায়। তুমি আমার ব্যাপারে আরেকটু "কাইন্ড" হতে পারো না।" অমিত উত্তরে বলত, "সেটা আবার কেমন?

অমিতকে ঘাটিয়ে যে লাভ হবে না এই সত্য অনুধাবনে করতে মিথিলার বেশীদিন লাগেনি। আস্তে আস্তে অনুযোগের মাত্রও কমে এসেছিল। তাই বলে প্রশংসা শোনার তৃষ্ণায় কোন ছেদ পড়েনি। আর তৃষ্ণা না মিটলে তো তৃষ্ণা আরো বাড়ে। তখন দূরের মরীচিকাকে মরূদ্যান মনে হয়।

মাঝে মাঝে মিথিলার মনে হয় মিথিলা হঠাৎ যদি কোনদিন উধাও হয়ে যায় তাতেও অমিতের মনে কোন ধরনের অস্থিরতা দেখা দিবে না। একবার ডক্টরদের একটা কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য অমিতকে মাস খানেকের জন্য জার্মানি যেতে হয়েছিল। মিথিলার কাছে সেই সময়টায় অমিত যেন মাসখানের জন্য হারিয়ে গিয়েছি। ফিরে এলে মিথিলা জানতে চেয়েছিল, "একবারে হারিয়ে গেলে যে...আমি কেমন আছি না আছি...তোমার মেয়ে তার কথাও মনে পড়ল না...একটা ফোনও তো করতে পারতে।"

অমিত হাসি মাখা ঠোঁটে জবাব দিয়েছিল, "ভাবলাম ব্যস্ত থাকবে তাই আর বিরক্ত করিনি।"

মিথিলা এখন আর নিজের জন্য অমিতের নীরবতায় বিচলিত বোধ করে না।বরং নাটকের রিহার্সালে যেতে না পারলে, থিয়েটারে দর্শক কম হলে বেশী বিচলিত বোধ করে। আর বিচলিত বোধ করে যখন সঞ্জয় অন্য ফিমেল আর্টিস্টদের সাথে কথা বলে বিশেষ করে জুনিয়র ফিমেল আর্টিস্ট। হারাবার ভয় তখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। নিজের ব্যাপারে অমিতের নীরবতা মিথিলার গা সহা হয়ে গেছে কিন্তু নিজেদের মেয়ের ব্যাপারেও অমিতের নীরবতা মিথিলার সহ্যসীমার প্রান্ত স্পর্শ করল।

নিজের অস্থিরতা আড়াল করার জন্য মিথিলা বেডরুমের দিকে এগুলো। যাবার সময় বলল, "আমি একটু শোব। খুব টায়ার্ড লাগছে।" কথার সুরে কোন অনুরোধ নেই যেমন...আমার সাথে তুমিও শোও, আমাকে একটু সঙ্গ দাও। বরং মিথিলা কথাগুলো এমন ভাবে বলল যে তার মানে দাঁড়ায় আমাকে বিরক্ত করো না।

অমিত যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ মিথিলার মনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তা অমিতের অজানা নয়। মিথিলা যে অমিতকে সব কিছুর জন্য দায়ী মনে করে এও অমিতের অজানা নয়। তাই মিথিলা যখন স্বেচ্ছায় সামনে থেকে উঠে গেল অমিতের মনে হল ভালই হয়েছে, পাশে থেকে আগুন ঝরানোর চেয়ে দূরে গিয়ে শান্ত থাকা ভাল। অমিত স্টাডিরুমের দিকে এগুলো।

স্টাডিরুমের ডিভানে আধ শোয়া হয়ে একটা মেডিকেল জার্নাল নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। কিছুক্ষণের মাঝে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। এক সময় মনে হল মাথার কাছে কে যেন সাইরেন বাজাচ্ছে। চোখ খুলে দেখল মাথার কাছে মোবাইল বাজছে। অমিত ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, "হ্যালো।"

"অমিত রায়হান বলছেন?"

"জি। আপনি?"

"আমি ইন্সপেক্টর আলম খান। আজ দুপুরে আপনি আর আপনার স্ত্রী থানায় এসেছিলেন আপনাদের মেয়ে হারিয়ে গেছে তা রিপোর্ট করতে।"

ইন্সপেক্টর আলমের নাম শুনে অমিত উঠে বসল। বলল, "হ্যাঁ...হ্যাঁ...কোন আপডেট আছে?"

"কিছুক্ষণ আগে একটা ফিমেল ডেড বডি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ডেড বডির ফিচারগুলো আপনারা যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন তার খুব কাছাকাছি। আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আপনাদের হেল্প দরকার। ঢাকা মেডিকেলের মর্গে বডি রাখা আছে। আপনারা কি আসতে পারবেন?"

অমিত এমন একটা ফোন কলের জন্য প্রস্তুত ছিলা না। ইন্সপেক্টরের কথায় মাথাটা কেমন যেন দুলে উঠল। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইল না ডেড বডিটা অমির হতে পারে। অমিতের খুব অসহায় বোধ হল। অমিতের নিস্তব্ধতায় ওপাশ থেকে ইন্সপেক্টর আলম বলল, "মিস্টার রায়হান, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?"

অমিত অসহায় কণ্ঠে বলল, "আমরা আসছি।"

ফোন রেখে অমিত বেডরুমের দিকে দ্রুত ছুটে গেল। দেখল মিথিলাও ঘুমিয়ে। জাগিয়ে বলল, "আমাদের এখনি ঢাকা মেডিকেলের মর্গে যেতে হবে।" মিথিলা অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকাল। অমিতের চোখে চোখ রাখতে বুঝতে পারল এ কোন হেঁয়ালি নয়। উঠে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল।

মেডিকেল কলেজের মর্গ অমিতের অপরিচিত নয়। পেশাগত প্রয়োজনে মর্গে নিয়মিত আসতে হয়। স্টুডেন্ট অবস্থায় তো মর্গ ছিল যেন খেলার জায়গা। সময়ের কোন বালাই ছিল না। সকাল, দুপুর এমন কি গভীর রাতেও মর্গে যাওয়া আসা ছিল। গল্পে সিনেমায় মর্গ হচ্ছে যেন বেদেহী আত্মার বাসস্থান। অমিতের কাছে কখনই তা মনে হয়নি। কিন্তু আজ মর্গে যাবার সময় অমিতের ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল।

মর্গের সামনে ইন্সপেক্টর আলমকে অপেক্ষা করছিল। অমিত আর মিথিলাকে দেখে বলল, "আসুন।" ভিতরে ঢুকে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা ডেড বডির সামনে সবাই দাঁড়াল। মর্গে কর্তব্যরত ডাক্তার ডেড বডির মুখের উপর থেকে কাপড় সরালো। রক্তাক্ত মুখ দেখে মিথিলা আঁতকে উঠল। আঘাতের তীব্রতায় মুখটা এমন ভাবে বিকৃত হয়েছে যে মুখ দেখে চেনার উপায় নাই। অমিত আর মিথিলা একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

উত্তেজনায় অমিতের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ছিল। ঘাম মুছে অমিত বলল, "ডেড বডির সাথে আমাদের বর্ণনার অনেক মিল থাকলেও আমার মনে হয় এটা অমি নয়।" অমিত মিথিলাকে নিয়ে বের হয়ে যেতে চাইলে মিথিলা বলল, "ডেড বডিটাকে একটু ওলটানো।"

কর্তব্যরত ডাক্তার প্রশ্নের ধারা বুঝতে না পেরে বলল, "সরি?"

মিথিলা আবারো বলল, "ডেড বডিটাকে ওলটানো। আমি পিঠের অংশটা দেখতে চাই।"

অমিত মিথিলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "মিথিলা তুমি কি বলছ?" মিথিলা উত্তরে কিছু বলল না। ডাক্তার ডেড বডিটা ওল্টালো। পিঠের নিচের অংশে একটা ট্যাটু সবার দৃষ্টি কাড়ল।

মিথিলা ট্যাটু দেখে বলল, "আংক। দি কি অফ লাইফ। ওটা সাথে থাকলে মৃত্যু কাছ ঘেঁষে না।"

অমিত অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ সব জানলে কি করে?"

মিথিলা বলল, "বাড়ি থেকে বেরুবার আগে অমি বলেছিল।" মিথিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। অমিত দ্রুত ধরে ফেলল।

৮

কানের কাছে খুটখুট শব্দ হতে অমিত চোখ মেলল। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হতে দেখল মিথিলা ট্রাভেল ব্যাগ গুছাচ্ছে। বুঝল মিথিলা কোথাও যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু অনুমান করতে পারল না গন্তব্য কোথায় হতে পারে। মাথার কাছে বেড সাইড টেবিলে রাখার টেবিল ঘড়ির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখল সাড়ে নটার মতো বাজে। রাতে ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে চোখ ভারী হয়ে এসেছিল। তবে সকালে উঠার তাড়া নেই। হসপিটাল থেকে বলা আছে যতদিন না মন স্বাভাবিক হয় ততদিন কাজে বিরতি।

অমিকে হারানোর পর থেকে জীবনের রুটিন একেবারে পাল্টে গেছে। কোন কাজে মন নেই। মনোযোগ ধরে রাখার মত শক্তি নেই। অমিতের মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যায়। যেখানে কোন কিছুর প্রতিযোগিতা থাকবে না, থাকবে না ভালবাসার অভিনয় আর মিথ্যে লোক দেখানো সামাজিকতা। মানুষ হয়ে জন্মানোর মানুষ হয়ে জন্মালে, উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ ধর্ম আর বংশের পদবী লাভ করে। মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিযোগিতা, ভালবাসার অভিনয় আর মিথ্যে লোক দেখানো সামাজিকতাকে অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। কারণ মানুষ এইসব গুণাবলী নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে এই ধরণীর আলো দেখে। এইসবই মানুষ হয়ে জন্মানোর পুরষ্কার।

দৃষ্টি আরেকটু স্বাভাবিক হতেই ভারী গলায় প্রশ্ন করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

মিথিলা কোন উত্তর দিল না। ভাব দেখে মনে হল যেন শুনতেই পায়নি। অমিত আবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

মিথিলা ব্যাগ গুছানোয় বিরতি দিল। একটু থেমে অমিতের দিকে না তাকিয়ে বলল, "প্রথমে মালিবাগে মিলির কাছে তারপর জানিনা।"

অমিত আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইল, "কতদিনের জন্যে যাচ্ছ?"

মিথিলা ম্লান গলায় উত্তর দিল, "বললাম তো জানিনা।"

"তার মানে?" অমিত বিছানায় উঠে বসল। চোখ কচলে ভাল করে মিথিলার দিকে তাকাল। দেখল মিথিলার মুখ থমথমে। আস্তে আস্তে বলল, "তুমি কি চলে যাচ্ছ?"

উত্তেজিত না হয়ে ভারী গলায় মিথিলা বলল, "এইখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি স্বাভাবিক থাকতে পারছি না।"

"কষ্ট কি আমার কম হচ্ছে? এই কঠিন সময়টাতে তো আমাদের পাশাপাশি থাকা উচিৎ।"

মিথিলা এবার অমিতের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "পাশাপাশি থাকার কথা বলছ, তোমার কি মনে হয় আমরা পাশাপাশি আছি। শরীরে হয়তো আছি কিন্তু মনে? এই কাছে থাকাকে কি কাছে থাকা বলা যায়?"

একটু থেমে মিথিলা বলল, "এ কি কাছে থাকার অভিনয় ছাড়া আর কিছু? সত্যি করে বলতো আমার কোন কিছু কি আর তোমাকে আকর্ষণ করে? যদি না করে তাতে আমি তোমায় দোষ দেবনা। কোন কিছুই অফুরন্ত নয়। সবকিছুরই শেষ থাকে। তুমি আমি বা তার থেকে আলাদা হতে যাব কেন। দিনের পর দিন তোমার এই পাশাপাশি থাকার অভিনয় কি ভাল লাগে?"

অমিত বলতে চাইল, "তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ একটুও কমেনি।" কিন্তু বলতে পারল না। মনের আঙ্গিনায় দুর্বার গতিতে ছুটে থাকা কথাটা দূরত্বের অদৃশ্য দেওয়ালে বাধা পেল। সত্য সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় কিন্তু যে সত্যে খাদ থাকে তা প্রতিষ্ঠা করা পাকা অভিনেতার পক্ষেও সহজ নয়। অমিত সেই চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। অনুনয়ের সূরে বলল, "আকর্ষণ না থালে কি একসাথে থাকা যায় না?"

"তা হয়তো যায়। কিন্তু ওই যে বললাম আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই একসাথে থাকার অভিনয় আর ভাল লাগছে না। আমি একটু একা থাকতে চাই। আর যার জন্যে একসাথে থাকার অভিনয়ের প্রয়োজন ছিল সেই যখন নেই তখন আর দীর্ঘায়িত করে কি লাভ?" কথাগুলো বলতে বলতে মিথিলার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এলো। মিথিলার মতো দক্ষ অভিনেত্রীকেও তার আবেগ সামাল দিতে বেগ পেতে হল।

অমিত নিরুত্তর। ডাক্তার হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জরুরী মুহূর্তে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে। রোগীর বাঁচা মরা নির্ভর করত সেসব সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু আজ এই কঠিন মুহূর্তে মোকাবেলা করার মতো কোন সমাধান খুঁজে পেল না। মনে হল নীরবতাই একমাত্র সম্বল।

মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। সম্পর্কের এই ক্রান্তি লগ্নে বর্তমানকে পেছনে ফেলে অমিতের মন ছুটে গেল অতীতে। মিথিলা আর অমিতের সখ্যতা শুরুর সেই সোনালী দিনগুলো অমিতের মনে ছবির মতো ভেসে উঠল।

অমিত সবেমাত্র এম.বি.বি.এস করে বেরিয়েছে। জুনিয়র ডক্টর হিসেবে চাকরি পেতেও তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। মেডিকেল কলেজ পড়ার সময় থেকে বন্ধুদের সাথে তুমুল আড্ডা হতো। পড়াশোনা শেষ হবার পরও আরো বছর খানেক আড্ডা টিকে থাকল। সাথে যুক্ত হল অর্থনৈতিক মুক্তি। রুঢ় বাস্তবতার ছায়া গ্রাস করনি তখনও। কিছু একটা করে ফেলার জন্য সবাই যেন মুখিয়ে আছে। পৃথিবীটাকে তুড়ি মেরে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন সবার চোখে মুখে। দু একজন সহপাঠিনী ছাড়া কারো তখনও বিয়েথা কিছু হয়নি। তবে প্রেমের সাগরে ডুব খাওয়া বন্ধু বান্ধবীর সংখ্যা কম ছিল না। এই প্রেম সাগরে ডুব খাওয়াদের বেশীর ভাগেরই সখ্যতা হয়েছিল লাইব্রেরিতে একসাথে টার্ম ফাইনালের প্রস্তুতি নেবার সময়। হায়রে লাইব্রেরি তো নয় যেন বৃন্দাবন। অনেকের আবার টার্ম পরিবর্তনের সাথে টার্ম ফাইনাল পার্টনারও বদলে যেত। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড।

অমিত এবং আরো কয়েকজন যারা ওই লাইব্রেরীর ছায়া মাড়ায়নি তারা পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে আড্ডা চালিয়ে গেল। পরিবর্তনের অঙ্গীকার মনে না থাকলেও মুখে ছিল। অনেক বিষয়েই কথা হতো। কথা থেকে তর্কে চলে যেত। সবাই সবার যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সোচ্চার থাকত। তবে সময়ের সাথে সাথে যুক্তির ধার কমতে শুরু করে। দু একজন ছাড়া আস্তে আস্তে সবাইকে বাস্তবতা গ্রাস করতে লাগল। অবিবাহিত সহপাঠিনী যারা আড্ডায় আসত তাদের বেশীর ভাগ বিয়ের পর সংসারের চাপে পরে আড্ডায় আসা বন্ধ করে দিল। যারা বাকী ছিল তাদের কথা বার্তাও ঘুরে ফিরে নিজেদের জীবন, জীবিকা আর অজানা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে আটকে রইল। পরিবর্তনের অঙ্গীকার আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল।

আড্ডার যখন এমন করুন দশা তখন একদিন আড্ডার সবচেয়ে সিরিয়াস আড্ডাবাজ দীপ্ত সবার মাঝে উদ্দীপনা যোগাতে মিথিলার নামের এক নতুন মঞ্চ অভিনেত্রীকে নিয়ে আড্ডায় হাজির হল। মিথিলার তখনও তেমন নাম ডাক হয়নি। মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। চোখেমুখে পৃথিবী পরিবর্তনের অঙ্গীকার না থাকলেও স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প খুব ছিল। আর সেটাই অমিতকে দারুণ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। সেই আকর্ষণে ডাক্তারির পাশাপাশি নাটক পাড়াতে যাতায়াত বাড়ল।

অমিতের আগ্রহ মিথিলার চোখ এড়ায়নি। প্রথমে ভালোলাগা তারপর ভালবাসা। তারপর দুজনের সংসার। প্রথমে ভালই ছিল। সবার যেমন থাকে। বিয়ের আগে ভালবাসা নামক অরণ্যের আড়ালে দুজনের অমিলগুলো লুকিয়ে থাকে। তারপর অরণ্যের রহস্যময়তা যখন কমতে শুরু করে তখন অমিলগুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। যে কারণে কারো প্রতি একসময় আকর্ষণ তৈরি করে, অমিলের ভারে সেই কারণে একসময় তাকে স্বার্থপর মনে হয়। অমিল তখন বিভেদের অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি করে। সেই দেওয়ালের মাঝে তখন মানুষ আটকা পড়ে। একবার আটকা পড়লে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

অমিত হাল ছাড়ল না। আবারও অনুনয়ের সূরে বলল, "আকর্ষণ না থাকেলে কি একসাথে থাকা যায় না?"

মিথিলা চোখ মুছল। ব্যাগের লক লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল, "প্লিজ বাধা দিও না।"

দরজার কাছে এসে একটু দাঁড়াল। দরজার পাশের দেওয়ালে অমির ছবির ফ্রেম ঝোলানো। বছর খানেক আগের তোলা ছবি। ছবিটা এত জীবন্ত যে মিথিলার মনে হল এখনি এসে বলবে, "মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?" মিথিলা ছবিটা স্পর্শ করতে চোখ ভারী হয়ে এলো। মুছে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দুজনের মিল অমিলগুলো অমিতের অজানা নয়। দুজনের মধ্যে শারীরিক মানসিক সব ধরণের ভালবাসাই ফিকে হয়ে এসেছিল অনেকদিন। তবে আজ এভাবে মিথিলা চলে যাবে, এমন একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিছু বুঝে উঠার আগেই মিথিলা বেরিয়ে গেল। ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর পর ভাবল হয়তো ভালই হল। কিছুদিন আলাদা থাকলে সব ঠিক হয়ে যেতেও পারে। কে নাকি বলেছিলেন দূরত্বে দূরত্ব বাড়ে। শরীরের দূরত্ব বাড়লেও মনের দূরত্ব তো কমতে পারে। অনন্ত অমিতের তাই মনে হল।

মিথিলা লিফট থেকে নেমে আসতেই কারপার্কে অপেক্ষমাণ কিছু ড্রাইভার আর অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার সবাই নড়ে চড়ে বসল। মঞ্চে অভিনয় করার সুবাদে মিথিলার জনপ্রিয়তা সবখানে। পাড়ার মুদি দোকান থেকে শুরু করে সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ সবাই চেনে। মাঝে মাঝে দু চারজন ফটোগ্রাফারকেও অ্যাপার্টমেন্টের সীমানার বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। সেলিব্রেটি বলে কথা।

মিথিলা কারপার্কে নেমে গাড়ির ড্রাইভার কবিরকে খুঁজল।

কবির এসে বলল, "ম্যাডাম গাড়ি বের করব?"

মিথিলা বলল, "গাড়ির চাবি দাও।"

মিথিলা গাড়ি স্টার্ট দিল। মিথিলা যখন গাড়ি চালায় কবির তখন পেছনে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকে। আজ যখন কবির গাড়িতে উঠতে গেল তখন মিথিলা বলল, "তোমাকে লাগবে না, আমি একা ড্রাইভ করব।"

এই ব্যস্ত ঢাকা শহরের মিথিলাকে কখনই একা ড্রাইভ করতে দেখেনি কবির। তাই সাথে না নেওয়ায় একটু অবাক হল তবে কিছু না বলে গাড়ি থেকে সরে দাঁড়াল।

কবির সরে দাঁড়াতে মিথিলা গাড়ির এক্সেলেটরে পা রাখল। গাড়ি এগুতে শুরু করল। মিথিলা অতি কষ্টে চোখের জল আটকে রেখেছিল। চাইছিল না তার মনের খবর বাইরের কেউ জেনে ফেলুক। গাড়ি অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিংয়ের সীমানা পেরোতেই চোখ ভিজে এলো। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। কোথা থেকে এক পিছুটান এসে যেন আচমকা টেনে ধরল। এতদিনের সম্পর্ক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা যতটা সহজ ভেবেছিল আসলে ততটা সহজ নয়। পুরনো স্মৃতিগুলো একত্র হয়ে পিছুটান তৈরি করল। দেখা যায় না ধরা যায় না শুধু অনুভব করা যায়।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ। সবাই যে যার মতো ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝে মিথিলা চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে গেল। যতবার মুছল ততবার চোখ পুনরায় ভিজে এলো। ঢাকা শহরে এখন অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা দারুণ জমজমাট। কোন ফাঁকা জায়গায়ই আর ফাঁকা নেই। পুরনো সব স্থাপনা উপরে ফেলে সেইসব জায়গায় গড়ে উঠছে প্রায় অমিত ছোঁয়া সব কংক্রিটের ইমারত। মিথিলাদের পাড়াও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। অদূর ভবিষ্যতে মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্য আর নাও দেখা যেতে পারে।

অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের প্রয়োজনে রাস্তায় ইট এবং রড বাহী ট্রাকের কমতি নেই। মিথিলাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শ"তিনেক ফুট দূরে সোজা রাস্তাটা ডানে বায়ে ঘুরে গেছে। বায়ের রাস্তায় দুটো প্লট বাদ দিয়ে তিন নম্বর প্লটে কাজ চলছে দেশের অন্যতম অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আর কে বিল্ডার্সের। রড বাহী ট্রাকের চালক বাদশা মিয়া আর কে বিল্ডার্সের সাইট সুপারভাইজার মোজ্জামেল হকের কাছে জানতে চাইল, "স্যার, রড নিয়া আসছি। নামামু কই? জায়গা তো দেখি না।"

মোজ্জামেল হক বলল, "মিয়া টাইম মতো তো আইতে পারো না। কংক্রিটের ট্রাকের লগে তোমার আওনের টাইম হইল। কংক্রিটের ট্রাক আগে আইছে, ওইটা আনলোড শেষ হইলে রড আনলোড হইব। অহনে ব্যাক করো। পাশের গলিতে থাকো। টাইম হলে খবর পাঠামুনে।"

"স্যার বেশীক্ষণ কইলে দাঁড়াতে পারুম না। দেরী হইলে পবলেম আছে।" এই বলে বাদশা মিয়া কারো সাহায্য ছাড়াই অই ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাক পেছনে নিতে লাগল। ঢাকা শহরে রাস্তার রাজা হচ্ছে ট্রাক। রাজাকে

দেখলে যেমন সবাই সরে দাঁড়ায়, ট্রাককে জায়গা দিতে রাস্তার অন্য যানবাহন এবং পথচারী রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল। শুধু একটা সাদা টয়োটা করোল্লা অবাধ্যের মতো রাজার দিকে এগিয়ে গেল। মিথিলার চোখ আবারো ঝাপসা হয়ে এলো। চোখ মুছে যখন সামনে তাকালো তখন দেখল ট্রাকের পেছনে থেকে রডগুলো তীরের মতো বেরিয়ে আছে। মুহূর্তে মধ্যে তা গাড়ির উইন্ড শিল্ড ভেদ করে মিথিলার দিকে ধেয়ে এলো। মিথিলা সরবার কোন সুযোগই পেল না। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই সাদা গাড়িটা যেন ট্রাকের পেছনে বেরিয়ে থাকা রডে ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় চারপাশ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। খানিক পর হইহই করতে করতে চার পাশ থেকে লোকজন ঘটনার কেন্দ্রে ছুটে গেল।

অমিত ইন্টারকমে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার করিম মিয়ার ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ শুনতে পেল।

"স্যার ম্যাডামের অ্যাকসিডেন্ট। এক্ষুণি নীচে আসেন।"

৯

আত্মবিধ্বংশী না হলে মৃত্যু কারো কামনার তালিকায় পড়ে না। পর পর দু দুটি মৃত্যু তো আরো না। এক মরণের শোক সামলাতেই যেখানে বেহাল দশা সেখানে দুই মরণের শোক তো সহ্যের অতীত। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যাদের ঘিরে রচিত হত হাসি, আনন্দ আর বেদনার কত কাব্য তাদের অবর্তমানে শূণ্যতা তৈরি হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হলেও, শূণ্যতাও মৃত্যুর মতো কারো কামনার তালিকায় পড়ে না। অমিতেরও না। অমিতের মনে হল এই শূণ্যতা যেন চারপাশের সবকিছু টেনে নিয়ে চারপাশ খালি করে দিচ্ছে। বিশাল একটা শূন্যস্থানের মাঝে অমিত একা। যতদূর দৃষ্টি যায় সব ফাঁকা।

মিথিলার মৃত্যুতে শুধু অমিত না সারা শহররেই শোকের ছায়া পড়ল। অমিতের চেয়েও বেশী শোকাহত হল দেশের মিডিয়া। সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মিথিলার তিরোধানের খবর ছাপাল। টিভি চ্যানেলগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রেকিং নিউজে মিথিলার খবর দেখাল। কোন কোন চ্যানেলে এই নিয়ে টক শো"ও দেখানো হল। মিথিলার মৃত্যু যে দেশের মঞ্চ নাটকের জগতে বিশাল এক ক্ষতি তা ঐ টক শোগুলোতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কথা দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়লেন। কেউ কেউ কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ ভিজিয়ে মিথিলার গুণকীর্তন করলেন। মিথিলার উছিলায় টিভিতে মুখ দেখাতে আগ্রহী জনের অভাব হল না।

এই শোকের মিছিলে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেল। তিল কে তাল করতে ওস্তাদ এমন কিছু ট্যাবলয়েডের সাংবাদিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে। কেউ শিরোনামে লিখল "মিথিলা চলে গেলেন, কার বিরহে?" , কেউ লিখল "তবে কি সংসারের অশান্তি কেড়ে নিল মিথিলাকে?" তারকা মায়ের মেয়ে হওয়ার সুবাদে অমির মৃত্যুর কারণ নিয়েও মানুষের আগ্রহের কমতি ছিল না। মায়ের মৃত্যুর সাথে মেয়ের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে এই সুযোগে সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কেউ লিখল "মা মেয়ের অন্তর্দন্দই কি কেড়ে নিয়েছিল মেয়েকে?" নিজেদের জাহির করতে এমনসব মুখরোচক শিরোনামে কলম চলল সাংবাদিকদের। সবারই একই উদ্দেশ্য মিথিলার মতো তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুত তুলে ধরে পত্রিকার কাটতি বাড়ানো। অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহী মানুষের অভাব পড়ে না। মিথিলাকে নিয়ে লেখা মুখরোচক খবরের পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও কম হল না।

অমির মৃত্যুর পর অমিত আ র মিথিলাকে দূর দূরান্ত থেকে অনেক আত্মীয় স্বজন দেখতে এসেছিল। মিথিলার মৃত্যুর পর দেখতে আসার শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা হল আরও বেশী। আত্মীয় স্বজন আর মিডিয়া থেকে শুরু করে চেনা জানা মানুষের ভিড়ে অমিত আর মিথিলার অ্যাপার্টমেন্ট "নীল কুটীর" গমগম করতে লাগল। মিথিলার অনেক ভক্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রধান ফটকের সামনের কংক্রিটের ফুটপাথে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। ফুলের সাথে কেউ কেউ মিথিলার বিদেহী আত্মার শুভ কামনা করে শোকবার্তাও লিখল। ফুল আর শোকবার্তায় কংক্রিটের ফুটপাথ ভরে গেল।

অগণিত মানুষের ভিড়ে অমিত বিপন্নবোধ করল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সবকিছু নীরবে সহ্য করে গেল। তবে সময়ের সাথে সাথে শোকের তীব্রতা কমে এলে আস্তে আস্তে মানুষের ভিড় কমে এলো । এক এক করে সবাই বিদায় নিল। শুধু কিছু ফটো সাংবাদিক ছাড়া। তারা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রধান ফটকের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, যদি কোন রহস্যের মড়ক উন্মোচন করা যায় সেই আশায়।

মানুষের ভিড় কমে এলে অমিত একটু স্বস্তি বোধ করল। এই কদিন মিথিলার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আর মানুষের ভিড় সামলাতে সময় চলে গেছে। কিছু নিয়ে ভাববার সময়ই পায়নি। ভিড় কমে এলে যখন ভাবনার ফুরসত মিলল তখন অমিতের মনে হল মানুষের ভিড়ে অপেক্ষমাণ সীমাহীন একাকীত্ব যেন গ্রাস করল। যেন এর থেকে মুক্তি নেই। তলিয়ে গেল সীমাহীন বিষণ্ণতায়। জীবনটা এমন এলোমেলো হয়ে যাবে অমিত কখনও কল্পনাও করেনি।

কিছুদিন আগেও মিথিলা যখন আলাদা হয়ে যেতে চাইছিল অমিত তখন বিচলিত হয়নি। ভেবেছিল মন অশান্ত থাকার চেয়ে দূরে থেকে যদি শান্ত থাকা ভাল। কিন্তু দূরত্ব এমনি বাড়া বাড়ল যে তা আর কখনো কমবার নয়। আলাদা থাকা মেনে নিতে পারলেও মিথিলার এহেন মৃত্যু অমিত মেনে নিতে পারল না। ডাক্তারিকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণে মৃতের স্বজনদের আহাজারি প্রায়ই শুনতে হয়। মৃত্যুর দৃশ্যও কখনো সখনো চোখে পড়ে। "জন্মিলে মরিতে হইবে" এ কথা অমিতের অজানা নয়। কিন্তু নিজের এমন এলোমেলো সময়ে অমিত এ কথা সহজে মেনে নিতে পারল না।

এ কদিনের ধকলে অমিত দারুণ ক্লান্ত। নাওয়া খাওয়া হয়নি ঠিকমতো। চুল দাঁড়ির পরিচর্যা না করায় দেখলে মনে হয় বয়স যেন এই কয়দিনে বছর দশেক বেড়ে গেছে। সবাই একে একে বিদায় নিলেও কিছু নিকট আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা দেবার জন্য থাকতে চাইলে অমিত সায় দিল না। একটু একা থাকার জন্য কাজের লোকদেরও অমিত সপ্তাহ খানেকের ছুটি দিয়ে বিদায় করল।

সবাই চলে যাবার পর থেকে ড্রইংরুমে চেইস লাউঞ্জে অমিত বসে রইল। ওই চেইস লাউঞ্জেই সকাল, বিকাল আর সন্ধ্যা কাটতে লাগল। দেহের বর্জ্য নিঃসরণে প্রয়োজন ব্যতীত লাউঞ্জে থেকে উঠল না। শোবার দরকার হলে লাউঞ্জটাই খাটের প্রক্সি দিল। শরীর ক্লান্ত হলেও মনের অশান্তিতে চোখের পাতা বন্ধ হয় না। শুধু এপাশ ওপাশ করে সময় কাটে। বুকটা বড্ড খালি খালি লাগে। চোখ বন্ধ হতে নিলেই অশান্তি চিৎকার করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। মনে তখন অনেক প্রশ্ন জাগে। কেন এমন হল? কিসের কমতি ছিল? কি পাপে, কোন অপরাধে এমন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে?

এ সময়টাতে অমিতের দুঃখের সাথে প্রচণ্ড অপমানবোধ হয়। চারিদিকে শোকের ছায়া। কিন্তু তার আড়ালে মনে হয় সারা পৃথিবী যেন অমিতের দিকে তাকিয়ে প্রহসনের হাসিতে মসগুল। চিৎকার করে বলছে, "পরাজিত।" আচমকা এক ঝড় এসে এতদিনের সাজানো বাগান যেন তছনছ করে দিয়ে গেল।

অতিরিক্ত ক্লান্তি, অবসাদ সাথে আধো ঘুম আর আধো জাগরণ অমিতের চারপাশে একধরণের ঘোর লাগা পরিবেশ তৈরি করল। বাস্তবে না ঘটলেও এই পরিবেশে অমিত মনের অজান্তে অনেক কিছুই

চোখের সামনে দেখতে পেল। একবার দেখল একজন মহিলা, অগোছালো চুল, চোখের নিচে কালি, পরনের শাড়ি ছেড়া অবিন্যস্ত, শাড়িতে ছোপ ছোপ রক্ত, হাত দুটো বুকের কাছে বাঁধা, যেন কিছু ধরে আছে। অমিতের কাছে দৌড়ে এসে বলল, "ডাক্তার সাহেব, আমার বাচ্চাটারে বাঁচান। ছাদ থাইকা পইড়া মাথা ফাইটা গেছে।" এই বলে মহিলা শাড়ির আঁচল সরিয়ে। মাথার খুলি দুভাগ হওয়া একটা দু আড়াই বছরের ছেলেকে দেখাল। অমিত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক এমনি সময় দুজন দীর্ঘদেহী সিকুরিটি গার্ড এসে মহিলাকে টেনে হেঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল। দূর থেকেও অমিত মহিলার আর্ত চিৎকার শুনতে পেল, "ডাক্তার সাহেব, আমার পোলাটারে বাঁচান। ওরা আমার পোলাটারে মাইরা ফালাইবো।"। মহিলার চিৎকারে অমিতের মন খচখচ করতে লাগল।

একদিন দেখল অমিতের নিজের মা তাহমিনা রহমানকে। তাহমিনা রহমান এসে অমিতের সামনের সোফাতে বসলেন। বললেন, "এখনো ঘুমাচ্ছিস? তুই তো কখনো এত দেরী করে উঠিস না।"

অমিত মা"র কথায় চোখ মেলার চেষ্টা করল। ক্ষীণ গলায় বলল, "মা, তুমি কখন এলে?"

তাহমিনা রায়হান বলল, "আমিতো এইখানেই থাকি। তুই এত ব্যস্ত তাই দেখেও দেখিস না।"

অমিত কি বলবে ভেবে পেল না। মেলানোমায় তাহমিনা রহমানের মৃত্যু হয়েছিল। অমিতের কোলে মাথা রেখে তাহমিনা রহমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। শুধু ভাবল মা ফিরে এলেন কিভাবে?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাহমিনা রহমান বললেন, "তোর নাকি বউ মা র সাথে বনিবনা হচ্ছে না? বনিবনা হবে কোত্থেকে? বউ মা কি তোর খেলার পুতুল যে সবসময় তোর মন জুগিয়ে চলবে?"

একটু থেমে তাহমিনা রহমান আবার শুরু করলেন, " ভালবাসলে চাওয়া পাওয়া থাকবে তাই স্বাভাবিক কিন্তু ভালবাসার মানুষের চাওয়া পাওয়া, পছন্দ অপছন্দও তো থাকতে পারে। তাকেও সম্মান দিতে হয়। সব কিছু নিজের মতো করে চাইলে ব্যবধান কমার জায়গায় ব্যবধান বাড়ে।"

অমিত কোন কথা না বলে বাধ্য ছেলের মতো মায়ের কথা শুনে গেল।

"বলিস ভালবাসিস কিন্তু কাজ করিস স্বার্থপরের মতো তাহলে কিন্তু ভালবাসা থাকবে না। কাউকে কাছে পাবি না। এক এক করে সব হারিয়ে যাবে।" তাহমিনা রহমানের কথা শেষ হতেই অমিত দেখল মিথিলা জানালার পর্দা সরাতে সরাতে বলছে, "ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছ কেন? কেমন একটা গুমোট পরিবেশ তৈরি হয়েছে, দেখেছ।"

অমিতের দৃষ্টি সরিয়ে মা তাহমিনা রহমানের দিকে তাকাল। তাহমিনা রহমানে যে সোফাতে বসে ছিলেন অমিত দেখল সেটা খালি। মিথিলা সেখানে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কাউকে খুঁজছ?"

অমিত অবিশ্বাসে চোখ বন্ধ করল। মাথার নিচ থেকে বালিশ নিয়ে নিজের মাথায় নিজেই চেপে ধরল। মনে মনে বলল এসব মনের ভুল। চোখ খুললেই দেখবে কেউ নেই। মিথিলা নেই। অমিত ধীরে ধীরে চোখ খুলল। দেখল মিথিলা অমিতের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুর্বল মনে অমিত বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারল না। মনে হল এটাই বাস্তব। মিথিলা, অমি কারোই অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাগুলো স্বপ্ন মাত্র। ঘুম ভাঙ্গলেই দেখবে এসব সত্য নয়। সব আগে যেমন ছিল তেমনি আছে।

অমিত সোফায় উঠে বসল। উঠে দাঁড়াতে চাইলে মনে হল পা দুটো যেন কেউ লোহা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। হাঁটার শক্তি নেই। অমিত সোফা থেকে গড়িয়ে নেমে শরীরটাকে টেনে হেঁচড়ে মিথিলার কাছে নিয়ে গেল। মিথিলার হাতে হাত রেখে অমিত অনুরোধের সুরে বলল, "মিথিলা আমার খুব একা লাগছে। আমাকে একা ফেলে যেও না। এতদিন ভাবতাম তুমি শুধু আমার। তোমার ধ্যান জ্ঞান সবই শুধু আমাকে ঘিরে। কখনো ভাবনি আমাকে ছাড়াও তোমার তো আরও কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকতে পারে। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই ভেবেছি। নিজের করে তোমাকে পেতে যেয়ে, তোমাকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর। প্লিজ ফিরে এসো।"

আকাশের কথা শেষ হতেই জানালার পাল্লা সজোরে জানালার ফ্রেমে আঘাত করল। অমিতের দৃষ্টি চলে গেল জানালার দিকে। বাইরে দারুণ মেঘ করেছে। সূর্যের অনুপস্থিতি চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাথে দমকা হাওয়া।

হঠাৎ শব্দ অমিতের বিভ্রান্ত মনেও নাড়া দিল। অমিত দেখল মিথিলা নেই, সোফা খালি।

এতক্ষণ অমিত হাঁটু গেড়ে মিথিলার হাত ধরে বসে ছিল। বিভ্রান্তি কাটতে দেখল হাত আসলে খালি সোফার হাতলের উপর রাখা। অমিত টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। জানালা বন্ধ করল। আরেকটু দেরী হলে বৃষ্টি সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। চারপাশে তাকিয়ে দেখল অনেকদিনের অযত্নে আসবাবপত্রে ধূলার আস্তর জমেছে। জানালার পাশের দেওয়ালে ঝুলানো ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখল সবাই চলে যাবার পর থেকে প্রায় দু সপ্তাহ অমিত ওই সোফাতেই কাটিয়ে দিয়েছে।

অমিত কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অমির ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। দরজায় ইংরেজিতে লেখা, "নক বিফোর ইউ এন্টার। ট্রেসপাসরস্ উইল বি প্রসিকিউটেড।" অমিত মনে মনে ভাবে ছোট থাকতে অমি ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে ভয় পেত। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ভয়ে চিৎকার করে উঠত। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাহসও বাড়ল, নিজের প্রাইভেসি নিয়ে সচেতনতা বাড়ল সাথে দরজাও বন্ধ হল। এখন বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকলে উত্তেজিত হয়ে বাড়ি মাথায় তোলে।

অমিতের মনে পড়ে অমি ছোট থাকতে রাতে ঘুমোবার আগে গল্প শোনানোর জন্য বায়না ধরত । মিথিলা গম্ভীর গলায় বলত, "বাবার কাছে যাও।" অমিত মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার এইধরনের সুযোগগুলো হাত ছাড়া করেনি কখনও। গল্পের ছলে মেয়ের সাথে বাবার সম্পর্কটাও হয়েছিল অন্যরকম। এই বয়েসটাতে মেয়েরা মা"দের যতটা বন্ধুভাবে, বাবা আর মেয়ের বন্ধুত্বটা হয়েছিল ঠিক সেরকম। অন্য মেয়েরা যেসব বিষয় নিয়ে বাবাদের সাথে আলোচনা করে থেকে বিরত থাকত অমি সেসব বিষয় নিয়ে অমিতের সাথে নির্দ্বিধায় কথা বলত। অমির বয়স তখন সাত। এক রাতে অমিত অমিকে গল্প শোনাতে যেয়ে দেখল মেয়ে মুখ গোমরা করে শুয়ে আছে। অমিত মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "কিরে মন খারাপ? মা কিছু বলেছে"

অমি কিছু বলল না। যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবে শুয়ে রইল। অমিত আবার জিজ্ঞেস করল, "স্কুলে কারো সাথে কিছু হয়েছে? কেউ বকেছে?"

অমি ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ডিভোর্স মানে কি?"

মেয়ের প্রশ্নে অমিত একটু অবাক হল তবে মুখে হাসি ধরে রেখে মেয়েকে পাল্টা প্রশ্ন করল, "কেন রে, কি হয়েছে?"

"আমার বন্ধু সানজানার বাবা মা"র নাকি ডিভোর্স হবে। আজ স্কুলে ও খুব মন খারাপ করেছিল। আমারও তাই মন খারাপ।" একটু থেমে অমি আবার জিজ্ঞেস করল, "ডিভোর্স হলে কি হয় বাবা?"

অমিত মেয়ের এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কি বলে যে মেয়েকে বোঝানো যায় কিছু খুঁজে পেল না। শুধু বলল, "কষ্ট হয়।"

অমি অমিতের কথা শুনে বলেছিল, "আমার যেমন মাঝে মাঝে অসুখ হলে তোমার আর মামনির কষ্ট হয় তেমন বাবা?"

"অনেকটা তেমন।" অমিত বলল।

"বাবা, আমার কি ডিভোর্স হতে পারে?" অমি চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করেছিল।

"নারে মা, ডিভোর্স শুধু বড়দের হয় ছোটদের হয় না। তুই ঘুমা। আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।" বাবার কথায় আস্বস্ত হয়ে অমি সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অমিত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। যেটা যেখানে থাকা উচিৎ সেটা সেখানে রাখা। পড়ার টেবিলের উপর ম্যাকবুক, বইগুলো সেলফে, কলম পেন্সিলগুলো হোল্ডারের ভেতর, ক্লোজেটের ভেতর অমির জামা কাপড় থরে থরে সাজানো। দেওয়ালে ঝুলানো এখনকার জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্যান্ড তারকাদের পোষ্টার। একবার অমির মাথায় গীটার শেখার পোকা ঢুকে ছিল। সেই গীটার স্ট্যান্ডের উপর রাখা। ঘরে আরো আছে অনেক অনেক কাল আগে বাবা আর মেয়ের বানানো ডলস্ হাউজ। পুতুল খেলার ঘর বানানো শেষ হলে অমি অমিতকে বলেছিল, "বাবা আমি এই ডলস্ হাউজটা সব সময় সাথে সাথে রাখব। যেখানে যাব সেখানে নিয়ে যাব।" অমির উত্তেজিত হওয়ার অনেক কারণ ছিল। যে ডলস্ হাউজ রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায় সেই হাউজ বাবা মেয়ে একটু একটু করে বানিয়ে শেষ করেতে প্রায় মাস খানেক লেগেছিল। যা সহজে পাওয়া যায় তার থেকে সহজে উৎসাহও চলে যায়। পাওয়ার প্রক্রিয়াটা একটু কঠিন হলে যে মায়া জন্মে তার রেশ অনেক দীর্ঘ হয়।

ডলস্ হাউসটার দিকে তাকিয়ে অমিত অমির বিছানা বসল আর তখনি মনে হল অমি যেন অমিতকে পেছন থেকে বাবা বলে জড়িয়ে ধরল। অমিতের চোখ আবেগে ভিজে উঠল। বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। অমিত শব্দ করে কেঁদে উঠল। বিছানা, বালিশ জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। অশ্রুর সাথে বুকে জমাট বাঁধা ব্যথাও যেন গড়িয়ে পড়ল।

বুকের ব্যথা একটু হাল্কা হতেই অমিতের চোখ ঘুমে বুজে এলো। ঘুমের মাঝে এক সময় স্বপ্ন দেখল, অমিত অমির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা ঠেলে অমিত ভিতরে ঢুকল। দেখল অমি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কিছু একটা লিখছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই অমি খাতা বন্ধ করে ম্যাটট্রেসের নিচে লুকিয়ে রাখল। অমিতকে ভেতরে ঢুকতে দেখে অমি প্রশ্ন করল, "বাবা, তুমি কি বাইরের সাইন দেখতে পাওনি? দরজা নক না করে কেন ঢুকেছ?"

"অনেকদিন তোকে গল্প শোনাইনি। একটা গল্প শুনবি।" এই বলে অমিত অমির পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অমি দ্রুত বিছানা থেকে উঠে বলল, "বাবা আজ আমি ব্যস্ত। আমাকে বেরুতে হবে।" বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দরজা শব্দ করে বন্ধ করল।

অমিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝল সবই স্বপ্ন ছিল। স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করল। অমি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কিছু একটা লিখছিল। দরজা খোলার শব্দ হতেই অমি খাতা বন্ধ করে ম্যাটট্রেসের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর আর মনে নেই। অমিতের অস্বস্তি হলে এত দ্রুত ভুলে যাবার জন্য। তখনি মনে হল ম্যাটট্রেসের নিচে খাতাটা যদি সত্যি থাকে। অমিত হাত বাড়াল। একটা চারকোনা বস্তু হাতে ঠেকল। বের করে দেখল হাতের চারকোনা বস্তুটি অমির ডাইরি।

১০

অমির ডাইরি হাতে নিয়ে অমিত ইতস্তত করতে লাগল। অন্যের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করা অমিতের পছন্দ না। তা সে বাইরের লোকই হোক আর নিজের মেয়েই হোক। তবে ব্যক্তির চিরবিদায়ে কি আর জিনিস ব্যক্তিগত থাকে? নিজেকে প্রশ্ন করে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না অমিত। দ্বিধা করতে লাগল।

অমিত মুখ তুলে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল। জানালাগুলো বন্ধ থাকায় ঘরটা গুমোট হয়ে আছে। বদ্ধ ঘরে কাঠের ফার্নিচারের গন্ধ বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। শ্বাস গ্রহণের সাথে অমিত তা অনুভব করল। উঠে পর্দা সরিয়ে ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। জানালা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে বাতাস হু হু করে ঢুকতে লাগল। বাইরের বাতাসে ঘরের নির্জীব ফার্নিচারগুলোও যেন সজীব হয়ে উঠল। বাইরের আলো ভেতরে ঢুকতে গুমোট ভাবটা অনেকখানি কেটে গেল। অমিতের মন কিছুটা হাল্কা হল।

অমিত, অমির ডাইরি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল। অমি ডাইরিটা বেশী দিন হল লেখা শুরু করেনি। অমিত দেখল প্রথম দশ বারো পাতার পর বাকি ডাইরি খালি। ভরা পৃষ্ঠাগুলোর বেশীর ভাগই প্রাচীন ঈজিপশিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্সের বিভিন্ন অক্ষর আর তার অর্থ লেখা। তার মধ্যে "আংখ" চিনতে কোন অসুবিধা হল না। আংখ দেখেই না মিথিলা অমিকে মর্গে সনাক্ত করেছিল। আংখের নিচে ইংরেজিতে লেখা "দি কি অফ লাইফ"।

কৈশোর পেরোনোর সময়টাতে প্রতিটি কিশোর কিশোরী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উন্মাদনায় ভোগে। অমি যে প্রাচীন মিশর নিয়ে উন্মাদনায় ভুগছিল জানতে পেরে অমিত রোমাঞ্চিত বোধ করল। সাথে দুঃখও হল। মেয়ের উন্মাদনার কথা জানতে এত দেরী হল। তাও জানতে হল মেয়ের ডাইরি পড়ে। ছোটবেলায় অমি নিজে থেকে সব কথা বলার জন্যে বাবার কাছে ছুটে আসত। বড় হবার সাথে সাথে কেমন দূরত্ব বেড়ে গেল। অমিতের মনে মনে বলল, "বড় হলে কি মানুষের দূরত্ব বেড়ে যায়?"

হায়ারোগ্লিফিক্স লেখা পাতাগুলো অমিত খুব ভাল করে বোঝার চেষ্টা করল। ভাবল অমির মৃত্যুর যদি কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। মৃত্যুর আগে অমির মনে কি ভাবনা খেলা করছিল অন্তত তাও যদি জানা যেত, তাহলে হয়তো সেই সূত্র ধরে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। মৃত্যুর কারণ কি হতে পারে, পুলিশও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে অমির দেহে নিষিদ্ধ মাদকের আলামত পাওয়া গেছে। পত্রিকায় বেরিয়েছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা ফ্যাশন করার জন্য উত্তেজনা বর্ধক মাদক সেবন করে। তারপর উত্তেজনা সামাল দিতে না পারলে কেউ কেউ আত্মহত্যার করতেও দ্বিধা বোধ করে। নিশ্চিত করে না বললেও পুলিশেরও ধারণা অমি আত্মহত্যা করেছে। এই যুক্তি মেনে নিতে পারেনি অমিত।

অনেক চেষ্টা করেও হায়ারোগ্লিফিক্সগুলো থেকে কোন সূত্র খুঁজে পেল না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ডাইরিটা বেশ কবার উল্টেও যখন উল্লেখ যোগ্য কিছু বের করতে না পেরে অমিত হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল করল দুটো পাতা একসাথে সেঁটে আছে। একসাথে সেঁটে থাকার কারণে ভেতরের লেখাগুলো অমিতের চোখে পড়েনি। পাতা দুটো আলাদা করতে অমিত দেখল বাম পাশের পাতায় লেখা - "জিসান - বিডি চ্যাটরুম।" আর ডানপাশের পাতায় শিপলু নামের এক বন্ধু পার্টিতে নুবিরার পাগলামির কথা। অমিত পড়তে শুরু করল। বর্ণনায় জিসানের নাম দেখতে পেল। প্রথমে ওই নাম দেখে ভেবেছিল অমির বয়ফ্রেন্ড হয়তোবা। তবে পুরোটুকু পড়া শেষ হলে মনে মনে বলল এমন ছেলে আর যাই হোক অমির বন্ধু হতে পারে না। অমিত অস্থির বোধ করতে লাগল।

অমিত বেশ কবার ডাইরির প্রথম থেকে শেষ পাতা উল্টে পাল্টে দেখল কিন্তু ডাইরির কোন ঘটনার সাথে অমির মৃত্যুর কোন যোগসূত্র খুঁজে পেল না। শুধু দুটো অজানা নাম ছাড়া। আরো কিছু পাবার আশা করেছিল। ভাবল স্বপ্নে এত কিছু থাকতে এই ডাইরি কেন দেখল? অর্থবহ কিছু না পাওয়ায় তাই অমিতের মনটা খচখচ করতে লাগল।

কোন যোগসূত্র না পেলেও অমিত হাল ছাড়ল না। অশান্ত মনে আরো একবার ডাইরির পাতা উল্টোতে লাগল। নুবিরাকে নিয়ে লেখা ঘটনাটা পড়তে যেয়ে অমিত থেমে গেল। ভাবল একবার নুবিরার সাথে কথা বলে দেখলে কেমন হয়। এইসব বয়সের ছেলেমেয়েরা মা বাবার চেয়ে বন্ধু

বান্ধবকেই বেশী আপন ভাবে। মনের কথা ভাগাভাগিও হয় বন্ধু বান্ধবের সাথে। জগতের নিয়মই এমন। "অমিবা এর ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?" অমিত ভাবল ।

অমির বন্ধু বান্ধবীর সাথে অমিতের তেমন একটা কথাবার্তা হতো না। কখনও দেখা হল কথাবার্তা সৌজন্য বিনিময় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কখনও কাউকে দরকার হলে মিথিলাই যোগাযোগ করত। সেজন্যে মিথিলা অমির বন্ধুদের ফোন নম্বর একটা তালিকা তৈরি করে রেখেছিল। অমিতের খুঁজে পেতে তেমন একটা বেগ পেতে হল না। ফোন নম্বরের তালিকা ফোনের পাশেই একটা ডাইরিতে রাখা ছিল। অমিত ডাইরি থেকে অমির বন্ধুদের ফোন নম্বরের পাতাটা বের করল।

নুবিরার নম্বর বের করে অমিত ফোনের বাটন চাপল। তিন চারটা রিং বাজা পর ওপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল, "হ্যালো।"

"আমি একটু নুবিরাকে চাচ্ছিলাম।" বলল অমিত।

"আপনি কে বলছিলেন, প্লিজ।" ওপর প্রান্ত থেকে গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল।

"আমি অমির বাবা।" একটু থেমে উত্তর দিল অমিত।

"আংকেল স্লামুয়ালাইকুম। কেমন আছেন?"

"ভাল। তুমি কেমন আছো?"

"জি ভাল।" একটু থেমে আবার বলল, "তবে বেশী ভাল না। অমি আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল।" নুবিরার গলা ধরে এলো।

অমিত কি বলবে ভেবে পেল না। একটু চুপ থেকে বলল, "অমির ব্যাপারে তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তোমার কি একটু সময় হবে?"

নুবিরা ধরা গলায় বলল, "জি বলুন।"

"তুমি ওর মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলে?"

"কেমন?"

"ও কি কখনও সুইসাইড করার কথা বলত?"

নুবিরা এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তড়িঘড়ি উত্তর দিল, "নাহ।"

অমিত আবার জানতে চাইল, "অমির মধ্যে কি কোন ধরণের উশৃংখলতা লক্ষ্য করে ছিলে? ড্রাগ অ্যাডিক্টদের মধ্যে যেমন দেখা যায়।"

নুবিরা আবারো একই উত্তর দিল, "না।"

নুবিরার অপ্রস্তুত কণ্ঠ শুনে অমিত বলল, "নুবিরা আমি দুঃখিত। এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চাইতাম না, কিন্তু না করে পারছিনা। তোমরা ভাল বন্ধু ছিলে। তাই ভাবলাম তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

একটু থেমে অমিত আবার জিজ্ঞেস করল, "অমির কি কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল?"

"বয়ফ্রেন্ড?"

"হু"

"ঠিক বয়ফ্রেন্ড না, তবে ক্লাসের একটি ছেলেকে ওর ভাল লাগত। ও বলেছিল।"

অমিত বলল, "ছেলেটির নাম কি জিসান?"

"না জিসান না। ওর নাম মনন। কিন্তু আপনি জিসানের নাম জানলেন কি করে?"

"অমির ডাইরি পড়ে জেনেছি। আরো একটা নাম জেনেছি, বাংলা ক্যাফে। তুমি জান কিছু?"

"জিসান আমাদের ক্লাসের কেউ না। বাংলা ক্যাফে একটা চ্যাট রুমের নাম। অমির সাথে জিসানের পরিচয় ওই চ্যাট রমে। জিসানকে আমি প্রথম দেখেছিলাম শিপলুর পার্টিতে। তবে জিসানকে আমার ভাল লাগেনি। কথাবার্তা একটু কেমন যেন।"

অমিত বলল, "মননকে কোথায় পাব বলতে পারো?"

"ক্লাসে আসলে দেখা পেতে পারেন।" একটু থেমে নুবিরা বলল, "আংকেল একটা কথা বলতে চাই।" আবার একটু থেমে বলল, "অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য অমির আমাদের বাসায় আসার কথা ছিল। তার আগে ওর মননের সাথে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় সেটা বলেনি। ওই ঘটনার পর থেকে মননও আর ক্লাসে আসছে না।"

"তোমার কি মনে হয় এর পেছনে মননের কোন হাত আছে?"

"জানি না আংকেল। মনে হল তাই আপনাকে বললাম।"

অমিত অস্থির বোধ করল। তবে কণ্ঠে প্রকাশ না করে বলল, "তোমার অনেক সময় ব্যয় করলাম। আজ রাখছি। ভাল থেকো।"

অমিত ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল। তবে মনের ভেতরটা খচখচ করতে থাকল।

১১

অমিত কলিং বেলের বাটন চাপল। কিছুক্ষণ পর ওপর পাশ থেকে নারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"কে?"

অমিত বলল,"আমি অমিত রায়হান। মননের সাথে দেখা করতে চাই।"

দরজার খোলার শব্দ পেল অমিত। দরজা ঈষৎ ফাঁকা করে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন,কি দরকার?"

অমিত বলল,"মনন আর আমার মেয়ে অমি একি ক্লাসে পড়ে। আমি একটু মননের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

মহিলা এবার অমিতের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ভাল করে তাকাতেই মহিলার ভ্রু কুঞ্চিত হল। বলল,"আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? খুব চেনা চেনা লাগছে।"

অমিত বলতে যাচ্ছিল,"আমার চেম্বারে হয়তো।" ঠিক তখনি কথা কেড়ে নিয়ে মহিলা বললেন,"মনে পড়েছে। পত্রিকায় দেখেছি...মিথিলা রায়হানের সাথে। আপনি অমিত রায়হান...মিথিলা রায়হানের হ্যাজবেন্ড,তাই না?"

অমিত উত্তরে বলল,"জি।"

মহিলা আগের কথার রেশ ধরে সমবেদনার সূরে বলল,"ঘটনাগুলো খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কি বলে যে সমবেদনা জানাবো, জানি না। আমরা সত্যি দুঃখিত।"

"ধন্যবাদ" প্রতিত্তুরে বলল অমিত। একটু থেমে বলল,"আমি কি মননের সাথে একটু দেখা করতে পারি।"

"অবশ্যই।" মহিলা এবার দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। বলল,"সরি অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম প্লিজ ভেতরে আসুন।" অমিতকে বসার ঘরে নিয়ে এসে বললেন,"আমি মননের মা। মননকে কি কারণে দরকার তা কি জানতে পারি?"

অমিত বসতে বসতে বলল,"অমিকে যারা চেনে তাদের কাছ থেকে অমি সম্পর্ক জানার চেষ্টা করছি। ভাবলাম তা থেকে যদি কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।"

"আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।" এই বলে মননের মা ভেতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, "প্লিজ ভেতরে আসুন। মননকে এখন একঘর থেকে আরেক ঘরে নেওয়া খুব কঠিন। ডাক্তার বলেছে ফুল রেস্টে থাকতে।"

মননের ঘরে প্রবেশ করে অমিত বুঝতে পারল কেন মননকে একঘর থেকে আরেক ঘরে নেওয়া খুব কঠিন। মননের ডান পা প্লাস্টারে মোড়া। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। অমিতকে দেখে মনন উঠে বসার চেষ্টা করল। অমিত মনন চেষ্টা দেখে বলল,"থাক থাক তোমাকে আর কষ্ট করে উঠে বসতে হবে না। তুমি শুয়ে থাকো।"

মনন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল,"স্লামুয়ালাইকুম।"

"ওয়ালাইকুমাসসালাম,কেমন আছো?"

"ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?"

"ভাল। তোমার স্কুলে গিয়েছিলাম। তোমার বন্ধু আবীর বলল তুমি বাড়িতে। ওর কাছ থেকে তোমাদের বাসা ঠিকানা পেয়েছি। যদি কিছু মনে না তাহলে তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। অমির সম্পর্কে।"

মনন কিছু বলল না। তবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

অমিত বলল,"আমি শুনেছি তুমি আর অমি ভাল বন্ধু ছিলে। তোমাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর ছিল?"

মনন একটু দম নিল তারপর বলল, "স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী।"

"তোমরা কি ক্লাসের বাইরে আউটিংয়ে যেতে?"

"ক্লাসের বাইরে দু একবার একটা ক্যাফেতে দেখা হয়েছে। আসলে আমাদের সম্পর্ক বেশিদূর এগোবার আগেই অমি চলে গেল।"

"যেদিন ওই ঘটনাটা ঘটে মানে অমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেদিন তুমি কোথায় ছিল?"

মনন কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর বলল,"ঠিক মনে পড়ছে না।"

"তোমার কি সেদিন অমির সাথে কোথাও দেখা করার কথা ছিল?"

অন্ত আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মনে পড়েছে...জি ওই দিন আমাদের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। আমি আমার সাইকেল নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে ছিলাম। তবে বেশিদূর যেতে পারিনি। বাসা থেকে বেরিয়ে অল্প কিছুদূর যাবার পর একটা মিশুক পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল। আমি তাল হারিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ো থাকা একটা ট্রাকের উপর ছিটকে পড়ি। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখি পায়ে প্লাস্টার আর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে আছি। আমি আর অমির সাথে দেখা করতে যেতে পারিনি। পরে বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম অমিকে ওই দিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর জানলাম অমি আর নেই।"

"তুমি ছাড়া ওই ক্যাফেতে কি আর কারো আসবার কথা ছিল?" অমিত মনে খুব আশা নিয়ে প্রশ্ন করল।

"আমার জানা মতে কারো আসার কথা ছিল না।"

"ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাথে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ওকে যতটুকু চিনি তাতে সবার সাথে গভীর বন্ধুত্ব না থাকলেও কারো সাথেই সম্পর্ক খারাপ ছিল না।"

"তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়।"

মনন না সূচক মাথা নাড়ল। অমিতের মনে জ্বলে উঠা আশার আলো কিছুটা ফিকে হয়ে এলো তবে হাল ছাড়ল না। বলল, "তোমাদের যে ক্যাফেতে দেখা করার কথা ছিল তার ঠিকানাটা দেবে?"

মনন বেড সাইড টেবিলে রাখা প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঠিকানা লিখে দিল।

অমিত ঠিকানা শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে উঠে দাঁড়াল আর বলল,"তোমার অনেক সময় দিলাম। তুমি রেস্ট নাও। আজ উঠি।

পেছন থেকে মননের মা এসে বলল,"সে কি, কিছু না খেয়ে চলে যাবেন তা কেমন দেখায়? একটু চা দিতে বলি?"

"ওসব ঝামেলা করতে যাবেন,প্লিজ। বরং আমাকে যেতে দিলে খুশী হবে।"

মননের মা আর কথা বাড়াল না। শুধু বলল,"ঠিক আছে জোর করব না। তবে আবার আসলে খুশী হব।"

মননের মা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় নেমে মননের লেখা ঠিকানাটা বের করে দেখল। ঠিকানা দেখে মনে অস্থিরতা বাড়ল। ক্যাফের ঠিকানা আর অমিতদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের খুবই কাছাকাছি। অমিত হিসাব করে দেখল বাসা থেকে মাত্র পনের মিনিটের হাঁটা পথ। মনে মনে বলল এই এত অল্প দূরত্বের মাঝে একটা জলজ্যান্ত কিশোরী হারিয়ে গেল। কি করে সম্ভব? তার মানে কি শিকারি কাছে ধারে কোথাও লুকিয়ে আছে? এত লোকের ভিড়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

অমিত একটা রিকশা থামিয়ে উঠে পড়ল। তারপর বলল,"পনেরো নম্বর চল।"

১২

ক্যাফে ব্লু বেরীর সামনে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে অমিত রিকশা ছেড়ে দিল। এ পথ দিয়ে আগেও অনেকবার আসা যাওয়া হলেও এই ক্যাফের উপস্থিতি অমিত কখনও খেয়াল করেনি। বাইরে থেকে দেখল ভেতরে উপবিষ্ট বেশীর ভাগেরই বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। তেমন একটা ভিড় নেই। অমিত ভিতরে ঢোকার জন্য পা বাড়াল। তবে ঢোকার আগ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত কিছুর মুখোমুখি হবার আশংকায় অমিতের মনে হল হৃদপিণ্ডের গতি যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল।

অমিত দোকানের ক্যাসবক্সের সামনে কর্মরত এক কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমি দোকানের ম্যানেজারে সাথে কথা বলতে চাই।"

"কি দরকার?" বলে পাল্টা প্রশ্ন শেষ করার আগে দোকানী থমকে গেল। "আপনি..." একটু বিরতি দিয়ে বলল, "অমিত রায়হান না?"

অমিত বলল, "জি আমি অমিত রায়হান। আমি দোকানের ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই। উনি কি আছেন।"

এবার দোকানী নিজের পরিচয় দিল। বলল, "জি আমি আব্দুল মোতালেব, দোকানের ম্যানেজার। আমি আপনার স্ত্রীর দারুণ ভক্ত। আমার স্ত্রী আবার নাটকের মহা পোকা। উনার সব নাটক দেখছে, থিরটারে গিয়ে। দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমি সব দেখতে পারিনি তবে কিছু দেখেছি। দারুণ অভিনয় করতেন। উনার এমন বিদায় খুবই দুঃখজনক।"

অমিত কি বলবে কিছু ভেবে পেল না। ভনিতা রেখে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

আব্দুল মোতালেব প্রশ্ন শুনে একটু হতবাক হয়ে বলল, "আমাকে...আচ্ছা বলুন আপনাকে কি করে সাহায্য করতে পারি।"

"আপনি আমার পরিবারের অনেক খবরই জানেন আশাকরি আমার মেয়ে খবরও নিশ্চয়ই জানেন।" আব্দুল মোতালেব হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ালেন।

আগের কথা রেশ ধরে অমিত বলল, "ও যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন ও আপনার ক্যাফেতে এসেছিল। ওর এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে। ওই বন্ধুর সাথে ওর দেখা হয়নি। আসবার পথে ওর বন্ধুর অ্যাকসিডেন্ট হয়। গ্রুপ স্টাডি করতে এখান থেকে আরেক বন্ধুর বাড়ি যাবার কথা ছিল। অমি সেখানেও যায়নি। তারপর থেকে কেউ আর ওর কোন খোঁজ দিতে পারছে না। তাই ভাবলাম আপনার এখানে কেউ যদি কিছু বলতে পারে। কেউ যদি কিছু দেখে থাকে।"

আব্দুল মোতালেব সব শুনে বলল, "এইখান থেকে হারিয়ে গেলে তো খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আপনি একটু বসুন আমি অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখি কেউ কিছু বলতে পারে কিনা।"

আব্দুল মোতালেব অমিতকে বসিয়ে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল। অমিত বসল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল মোটামুটি সব টেবিলে

জোড়ায় জোড়ায় বসা। দু একজন ছাড়া সবাই নিচু স্বরে কথা বলছে। মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে একজন আরেকজনের উপর হেসে ঢলে পড়ছে।

অমিতকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্দুল মোতালেব একজন কর্মচারীসহ হাজির হল। বলল, "ও রতন। আপনাকে কিছু বলতে চায়।" অমিত উৎসুক দৃষ্টিতে রতনের দিকে তাকাল।

রতন শুরু করল, "ওই দিন ম্যাডাম একা এসেছিলেন। কফির অর্ডার দিয়েছিলেন। বার বার ঘড়ি দেখছিলেন দেখে মনে হল কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা বিশ বাইশ বছরের ছেলে আপার টেবিলে যেয়ে বসল। আপার কথা বলার ধরণ দেখে মনে হল আপা ওই ছেলেকে চেনেন তবে উনি অন্য কারোর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর দেখলাম আপা চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল আর মাটিতে পড়ার আগেই আপার বন্ধু আপাকে ধরে ফেললেন। আমি যেয়ে বললাম, স্যার আপার কি হয়েছে? উনি বললেন, আপার মাথা ঘুরছে, সিজোনাল ফ্লু মনে হয়। আমাকে একটা সি.এন.জি ডেকে দিতে বললেন। তারপর আপাকে নিয়ে সি.এন.জি তে করে চলে গেলেন। এরপর আপার মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে দেখলাম।"

সব শুনে অমিতের উত্তেজনা কপালে ঘাম দিয়ে প্রকাশ পেল। অমিত ঘাম মুছে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বের করল। মননের সাথে আলাপকালে আড়ালে মননের একটা ছবি তুলে ছিল। সেটা দেখিয়ে জানতে চাইল, "এই কি সেই ছেলে?"

রতন আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিল, "না। এ সে নয়। ওই ছেলের বাম কানে দুল আর ডান চোখের উপরের ভ্রু ছিদ্র করে ছোট্ট স্টিলের টুকরা ঢুকানো ছিল।"

এ কথায় অমিতের উত্তেজনা আরো বাড়ল। মনেমনে বলল, "এ কাদের সাথে অমি জড়িয়ে পড়েছিল।" অমির বন্ধু বান্ধবী নির্বাচন করা নিয়ে অমিত কখনও মাথা ঘামাত না। অমির বিবেচনায় অমিতের পূর্ণ আস্থা ছিল। রতনের বর্ণনা শুনে অমিত দ্বিধায় পড়ে গেল। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তাকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

"জি স্যার চিনতে পারব।" দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল রতন।

অমিতের মনে আশার আলো আবার জ্বলে উঠল। এই এত মানুষের শহরে কিভাবে খুঁজে পাবে ওই ছেলেকে - এ কথা ভাবতেই আশার আলো যেভাবে জ্বলে উঠেছিল ঠিক সেভাবে আবার নিভু নিভু করতে লাগল। অমিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় চোখে আশে পাশে তাকাল। ক্যাফের সিলিং এর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সিলিং থেকে সিকিউরিটি ক্যামেরা ঝুলছে। আশার আলোয় এবার যেন বিস্ফোরণ ঘটল। ম্যানেজার আব্দুল মোতালেবকে সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখিয়ে বলল, "আপনাদের সিকিউরিটি সিস্টেমে নিশ্চয়ই সেদিনকার ফুটেজ সেভ করা আছে। সেখান থেকে রতন নিশ্চয়ই সনাক্ত করতে পারবে?"

অমিতের প্রশ্নে ম্যানেজার আব্দুল মোতালেবের মুখ চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়া সিঁধেল চোরের মতো দেখাল। মুখ কাঁচু মাঁচু করে গলা নামিয়ে বলল, "স্যার কিভাবে বলি...(আমতা আমতা করে বলল) আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম আসল সিকিউরিটি সিস্টেম না, নকল, লোক দেখানো। ক্যাফের ভেতর যাতে কেউ ঝামেলা না করে তাই ক্যামেরার মতো দেখতে ওগুলো লাগিয়ে রেখেছি। ওগুলো দেখলে কেউ আর ঝামেলা করার সাহস করে না।"

এই কথায় অমিতের উৎসাহে যেন পাথর চাপা পড়ল। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল। অনেক কষ্টে মনের উত্তেজনা সামলাল। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ম্যানেজার আব্দুল মোতালেব আর রতনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় বেরিয়ে অমিত অস্থির চিত্তে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটা শুরু করল। চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো। রহস্যের জট খুলতে যেয়ে রহস্য যেন আরো জট পাকিয়ে গেল। অমি জ্ঞান হারালো কেমন করে? অমিত মনে করার চেষ্টা করল। অমির শরীর খারাপ ছিল আর ডাক্তার হয়ে সে কথা বুঝতে পারবে না অমিত তা মানতে পারল না। সিজোনাল ফ্লু হতে পারে। কিন্তু তাতে তো জ্ঞান হারাবার কথা না। অমিত কিছুতেই জ্ঞান হারাবার কোন কারণ খুঁজে পেল না।

মনের অস্থিরতা অমিতের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। অস্থিরতা ঘাম হয়ে শরীর ত্যাগ করল। তৃষ্ণায় গলা শুকালো। তৃষ্ণা মিটানোর কথা মাথায় আসতেই আর একটা ভাবনা সাথে এসে ভর করল। ভাবল অমির কফিতে কিছু মিশানো ছিল না তো? হয় তো অমির পরিচিত ওই ছেলে কথার ছলে কফিতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে ছিল। যার প্রভাবে অমি জ্ঞান হারিয়ে ছিল। হতে পারে, এমন হতেই পারে, অমিত বিড় বিড় করতে লাগল। বাজারে এমন অনেক মাদক পাওয়া যায় যার প্রভাবে মানুষ খুব সহজেই জ্ঞান হারাতে পারে। ইমার্জেন্সিতে কাজ করার সময় মাদক সেবনে জ্ঞান হারানো এমন অনেক তরুণ তরুণীকে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তুলেছিল। অমিতের মনে সন্দেহ প্রখর হল। কে সে? কেনই বা এমন হল? ভাবতে ভাবতে অমিত এগিয়ে চলল।

প্রখর রোদে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল একবার নুবিরার সাথে কথা বলা দরকার। অমির ডাইরি পড়ে জেনেছিল নুবিরাও একি বিপদে পড়েছিল। ভাগ্য ভাল সাথে অমি থাকায় সে যাত্রায় নুবিরা রক্ষা পেয়ে ছিল। অমির দুর্ভাগ্য অমির সাথে কেউ ছিল না।

অমিত ঘড়ি দেখল। দিনের এবেলায় স্কুল পড়ুয়াদের তো স্কুলে পাওয়া যাওয়া উচিত। নুবিরার সাথে স্কুলে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা, অমিত একটু ভাবল। দেখল মনে শান্তি আনতে চাইলে দ্রুত দেখা করা প্রয়োজন। মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকা দায়িত্বশীল ভাবনাগুলোকে পাত্তা না দিয়ে নুবিরার সাথে দেখা করতে অমিত একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

১৩

অমিত স্কুলে পৌঁছে দেখল স্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলছে। স্কুলের মাঠে দলে দলে ভাগ হয়ে খেলাধুলায় ছোট বড় সবাই মহা ব্যস্ত। বড়দের চেয়ে ছোটদের সংখ্যাটা একটু বেশী। যাদের খেলাধুলায় আগ্রহ একটু কম তারা গল্পে মসগুল। সকলের কোলাহলে স্কুলের ভেতর একটা উৎসব মুখর পরিবেশ। অমিতের মনের বিষণ্ণতা একটু কমল।

এত ছেলে মেয়ের ভিড়ে কোথাও নুবিরাকে দেখতে পেল না অমিত। ভাবল মাঠের আশে পাশে নেই হয়তো ক্লাসে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। ক্লাসে পৌঁছে সেখানেও দেখতে পেল না। তবে চারজনের একটা দলকে দেখতে পেল। অমিতের মনে হল অমির সাথে এদের আগে দেখেছিল। কাছে যেতেই সবাই আড্ডা থামিয়ে অমিতের দিকে তাকাল। অমিত পরিচয় দিতেই মেয়েদের একজন বলল, "হ্যালো আংকেল, আপনাকে আমরা চিনতে পেরেছি। আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?"

"তোমরা কি নুবিরাকে দেখেছ?"

"না, আজ তো ও স্কুলে আসেনি।" মেয়েদের একজন বলল।

অমিতের আশায় গুড়ে বালি। মনেমনে বলল - স্কুল কামাই দেওয়ার আর টাইম পেলি নারে বেটি। আর কথা না বাড়িয়ে অমিত ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এলো। করিডোর থেকে স্কুলের মাঠ দেখা যায়। অমিত ইটের রেলিংয়ে ভর দিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। মনের গহীনে যেন কেউ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এত শিশুর কোলাহলে সেই চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেঘের গর্জনে অমিতের ঘোর কাটল। দেখল মেঘের আড়ালে সূর্য হারিয়েছে। এখনি নামবে বৃষ্টি। প্রকৃতি যেন অমিতের কষ্টের সাথী

হতে চাইল। বৃষ্টির কান্নায় ঝড়িয়ে দেবে মনের কষ্ট অমিতের তাই মনে হল।

অমিত করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করল। অল্প কিছুদূর এগুবার পরই করিডোরের বাঁক ঘোরার সময় ওপাশে হাঁটতে থাকা একজনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। অভ্যাসবশত সরি বলে অমিত দ্রুত সরে গেল। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বাম কানে দুল আর ডান চোখের উপরের ভ্রু ছিদ্র করে ছোট্ট স্টিলের টুকরা ঢুকানো চোখে পড়ল। অমিতের মন চমকে উঠল। দ্রুত বয়স অনুমান করার চেষ্টা করল। বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে।

অমিতের চমকানো দেখে ছেলেটি হেয়াঁলি কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার...আগে কখনও পিয়ারসিং দেখেননি নাকি?" বলে হেঁটে চলে গেল। অমিতের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। ক্যাফের কর্মচারী রতন তো এমন বর্ণনাই দিয়েছিল। এমন ফ্যাশন তো আরো অনেকেই করতে পারে। তাই বলে এতো মিল হবে? অমিতের মনে প্রশ্নের বন্যা বয়ে গেল।

হতভম্ব অমিত ছেলেটিকে আড়ালে অনুসরণ করতে লাগল। ছেলেটি করিডোর ধরে হেঁটে সব ক্লাসরুম পেরিয়ে টিচার ব্লকে চলে গেল। অমিতও পেছন পেছন গেল। দেখল টিচার ব্লকে ছেলেটি একটি রুমের বন্ধ দরজায় ঠক ঠক শব্দ করতে দরজা খুলে গেল। ছেলেটি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অমিত নেম প্লেটে দেখল লেখা "আনোয়ার জামিল, প্রভাষক ইংরেজি।" অমিত দরজায় কান পেতে ভেতরের কথোপকথন শোনার চেষ্টা করল। স্পষ্ট করে শুনতে না পেলেও যা শুনল তা মন্দ না। শুনল ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে কেউ, মনে হয় আনোয়ার জামিলই হবে প্রশ্ন করল, "তুমি এখানে এসেছ কেন?"

"আপনি অমাবস্যার চাঁদ হয়ে অন্ধকারে মিশে আছেন তাই তো খোঁজ নিতে এলাম।"

"ঝামেলা তো তুমি বাধিয়েছ। কে বলেছিল তোমাকে সেলিব্রেটি ধরে আনতে? জানোনা সেলিব্রেটির ফ্যামিলিও সেলিব্রেটি। সবার চোখ তাদের দিকে।"

"আপনি তো বললেন সস্তা মালে ঘেন্না ধরে গেছে। কোনো অ্যাকসাইটমেন্ট নাই। আপনার অ্যাকসাইটমেন্টের কথা চিন্তা করেই না, আর এখন বলছেন সব আমার দোষ? ওই মালতো আপনি আমায় চিনিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন এমন কিছু যোগাড় করতে পারলে পুরষ্কার দেবেন।"

"সেটাও তো ঠিকমতো করতে পারলে না। হাত ফসকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ যদি দেখে ফেলত। তাহলে কি সর্বনাশটাই না হয়ে যেত। বলেছিলাম বিছানার সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে। বারান্দায় গেল কিভাবে আর বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লই বা কিভাবে? ড্রাগের ডোজটাও কি ঠিকমতো দিতে শেখোনি?"

"সব বার যে ডোজ দেওয়া হয়, এবারও তাই দেওয়া হয়েছিল। গণ্ডগোল কোথায় হয়েছিল আমি কি করে বলব।"

"এখন কি চাও তুমি?"

"জানেন তো সবকিছুর একটা খরচ আছে। ধরে আনতেও বেশ পরিশ্রম করতে হয়। পারিশ্রমিক না হলে চলে কেমনে?"

"পারিশ্রমিক...কিসের পারিশ্রমিক? ভিডিও সাপ্লাই না দিতে পারলে কিসের পারিশ্রমিক? বেশী টাকা, টাকা করো না। বরং ঝামেলা না করে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকো।"

"এটাই আপনার শেষ কথা?"

"শেষ কথা মানে...জিসান, মুখে মুখে তর্ক করবে না। যা বললাম তাই কর।"

এতক্ষণ যা শুনল তাতে অমিত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এরা শিক্ষক না শিক্ষকের মুখোশ ধারী শয়তান? জ্ঞানের বাগানে এ কাদের বাস? অমিতের শরীর টলতে লাগল। মনে হল এখনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু এখন চিন্তা এলোমেলো হলে চলবে না। নিজেকে সামলে নিল অমিত।

দরজা খোলার শব্দে আড়ালে সরে দাঁড়াল। জিসান দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অমিত পিছু নিল। যে সব সময় শিকার করে বেড়ায় সে কখনও ভাবে না যে সে কারো শিকার হতে পারে। এই শিকারিও তার ব্যতিক্রম হল না। জিসান একটুও ভাবল না যে কেউ তার পিছু নিতে পারে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে জিসান একটি রিকশা ডেকে উঠে পড়ল। অমিত আরেকটি রিকশা নিয়ে পেছন পেছন অনুসরণ করল। রিকশা দুটো রাস্তার খানা খন্দ, মানুষ আর যানবাহনের জট পেরিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। অমিতের সন্দেহ সত্যি হতে শুরু করেছে কারণ অমিকে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পেছনে পাওয়া গিয়েছিল।

জিসান রিকশার ভাড়া মিটিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিংয়ের লিফট দিয়ে উপরে উঠে গেল। জিসানের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য অমিত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে লাগল। আর চোখ রাখল লিফট কোন তলায় গিয়ে থামে।

লিফটের দরজা পনেরো তলায় উঠে খুলে গেল। অমিত ষোল তলার সিঁড়ির ঘর থেকে দেখল জিসান "গ" ইউনিটে প্রবেশ করল। প্রবেশ করার ঠিক আগ মুহূর্তে মোবাইলে ছেলেটির ছবি তুলে নিল। এতক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠার কারণে অমিতের মনে হল সারা শরীর যেন কাঁপছে। উত্তেজনায় হৃদপিণ্ড দুর্বার গতিতে সংকুচিত আর প্রসারিত হল। সাথে দ্রুত শ্বাস পড়তে লাগল।

অমির মৃত্যু রহস্য জট এক এক করে খুলতে লাগল। অমিতের মনে আর কোন দ্বিধা নেই। তাও শেষ বারের মতো নিশ্চিত হবার জন্য অমিত লিফট দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নিচে নেমে এলো। একটা রিকশা ডেকে বলল, "পনেরো নম্বর চল।"

ক্যাফে ব্লু বেরী পৌঁছে অমিত রতনের সাথে দেখা করতে চাইল। অমিত বসতে বলে ম্যানেজার আব্দুল মোতালেব কিচেন থেকে রতনকে ডেকে নিয়ে এলো। অমিত রতনকে দেখে বলল, "আমি একটু একা কথা বলতে চাই।"

ম্যানেজার মোতালেব কথা না বাড়িয়ে বলল, "নো প্রবলেম স্যার, প্লিজ কথা বলুন।"

অমিত মোবাইল তোলা ছবি রতনকে দেখল। রতন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "স্যার, এই সেই।"

অমিতের প্রতিটা কোষে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন যেন চোখেও ফুটে উঠল। রতন বলল, "স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?"

কিছু না বলে অমিত উঠে দাঁড়াল তারপর বেরিয়ে গেল।

১৪

হাতে সময় খুব কম। যা করার দ্রুত করতে হবে। আরেকটি বিপদ ঘটবার আগেই শিকারিকে ধরতে হবে। অমিতের উত্তেজনায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। উত্তেজনায় কিছুতেই খেই হারানো চলবে না। অমিত মাথা ঠাণ্ডা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিল। যেতে যেতে শিকার ধরার কৌশল এবং পরবর্তীতে কি করণী তা ঠিক কর নিল।

অনেকদিন আগে অমি একবার বাথরুমে ভেতর আটকা পড়ে ছিল। বাথরুমের দরজা এমনি জ্যাম হয়েছিল যে কোন ভাবেই তা খোলা যাচ্ছিল না। অমিত তখন হার্ডওয়্যার ষ্টোর থেকে তালা খোলার একটা

সেট নিয়ে এসেছিল। অনেকটা স্ক্রু ড্রাইভারের মতো দেখতে। একটা অংশ তালার ছিদ্র দিয়ে আর আরেকটা অংশ দরজা ফ্রেম আর দরজা ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে ডানে বায়ে একটু নাড়ালে বন্ধ দরজা খুলে যায়। অমিত শিকার ধরার জন্য বাড়ি থেকে তালা খোলার সেট আর কয়েকটা সিরিঞ্জে অ্যানেস্থেটিক ভরে নিল। অ্যানেস্থেটিক ভর্তি সিরিঞ্জ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। তবে বাড়িতে অ্যানেস্থেটিক কেন রেখেছিল অমিত তা মনে করতে পারল না।

দ্রুত সব গুছিয়ে নিয়ে শিকার ধরতে অমিত বেরিয়ে পড়ল। হান্টিং গ্রাউন্ডে পৌঁছাতেও বেশী সময় লাগল না। "গ" ইউনিটের দরজা ভেতর থেকে লাগানো। অমিত বুঝল শিকার ভেতরেই আছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়া যায়। তবে ভেতরে অবস্থা না জেনে আক্রমণ করতে গেলে পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে। ঠিক করল শিকার বেরিয়ে এলে তারপর ভেতরে ঢুকে ফাঁদ পাতা হবে। অমিত আগের বারের মতো ষোল তলার সিঁড়ি ঘর থেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্পক্ষণের ভেতরেই দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। জিসান বেরিয়ে এলো। দরজা লক করে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর লিফট এলে তা দিয়ে নিচে নেমে গেল। একটুও বুঝতে পারল না এক শিকারিকে ধরার জন্য আরেক শিকারি ঘাড়ের কাছেই ওঁত পেতে আছে।

অমিত আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ষোল থেকে পনেরো তলা নেমে এলো। তালা খোলার সরঞ্জাম দিয়ে তালা খুলতে অমিতকে খুব একটা বেগ পেতে হল না। খুব সহজেই ইউনিটের দরজা খুলে গেল। অমিত শিকারি বাঘের মতো পা টিপে টিপে ভেতরে প্রবেশ করল।

ইউনিটটা তেমন বড় নয়। তবে একজনের জন্য যথেষ্ট। ভেতরে ঢুকে অমিতের ড্রয়িংরুম, ডাইনিং স্পেস আর কিচেন চোখে পড়ল। সাধারণ মানের অল্প কিছু ফার্নিচার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। জানালার পর্দাগুলো মনে হয় সবসময় বন্ধই থাকে। বাইরের আলো বাতাস ভেতরে প্রবেশ না করায় কেমন একটা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ মরা ফার্নিচারগুলো চারপাশ দখল করে আছে। অমিত বেডরুমের আলো জ্বালালো। দেখল একটা ম্যাটট্রেস তার সামনে একটা ভিডিও ক্যামেরা তাক করা। ঘরে ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল চেয়ার আর একটা শেলফ দেখতে পেল। টেবিলে উপর গটা ছয়েক সিরিঞ্জ আর এম্পুল রাখা। একটা এম্পুল বাদে বাকী সব ভরা। অমিত ভাবল তবে কি শিকারি আবার শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে?

শেলফের তাকগুলোতে অসংখ্য ভিডিও ক্যাসেট। ক্যাসেটের গায়ে নাম লেখা। অমিত অমির নাম খুঁজল কিন্তু পেল না। ভিডিও ক্যামেরা অন করল। কিছুদূর রিওয়াইন্ড করতে অমির নিরাবরণ অবচেতন দেহের ফুটেজ খুঁজে পেল। অমিতের চোখ নিজে থেকে বন্ধ হয়ে এলো। কোন বাবাই তার মেয়ের এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হতে চায় না। অমিত ভিডিও ক্যামেরা থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে পকেটে রাখল।

টেবিলের পাশের দরজা বাতাসের ঝাপটায় নড়ে উঠে অমিতের মনোযোগ আকর্ষণ করল। দরজা সরিয়ে দেখল একচিলতে বারান্দা। বারান্দা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকাতেই মুহূর্তের জন্য অমিত যেন অন্য কোন জগতে হারিয়ে গেল। চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল শূন্যে ভেসে উঠা আতংকিত অমির মুখ। অমি যেন বলছে, "বাবা আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।" তারপর শূন্য থেকে মাটির দিকে দ্রুত নেমে গেল।

অমিত যেভাবে অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেভাবেই আবার বাস্তবে ফিরে এলো। ঘরের বাতি নিভিয়ে শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

এবারে অপেক্ষার পালা অন্য সময়ের তুলনায় দীর্ঘ হল। মাঝে একবার ঘড়ি দেখল, প্রায় দু ঘণ্টা পাড় হয়ে গেছে। শিকারের অন্যতম হাতিয়ার ধৈর্য। তা হারালে চলবে কি করে!

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অপেক্ষার পালা যেন শেষ হল। অমিত দরজা খোলার শব্দ শুনল। দরজা খুলতে বাইরের আলো এসে ভেতরে ঢুকল। অমিত চুপচাপ কিচেনের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আগন্তুক একা আসেনি। দেখল সাথে একটি অল্প বয়সী মেয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখল এ তো আর কেউ নয়, অমির বান্ধবী নুবিরা, নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ বুঝতেও দেরী হল না। দরজা খুলে মেয়েটিকে দু হাতে পাঁজকোলা করে দ্রুত বেডরুমের নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিল আর নিজে হাঁপাতে লাগল।

অমিত যা ভেবে ছিল ঠিক তাই হল। শিকার নিজেই শিকারের খোঁজে বেরিয়েছিল। শিকার করে শিকারি এখন ক্লান্ত। চাইলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু অমিত নিজেকে সামলে নিল। শিকার যাতে কোন ভাবে পালিয়ে যেতে না পারে তাই কোন রকম সুযোগ দেওয়া চলবে না। অমিত আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিল।

তবে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শিকার নিজেই স্বপ্নের জগত থেকে ঘুরে আসবার মন্ত্র হিসেবে টেবিলে রাখা ড্রাগ নিজের দেহে সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করল । ড্রাগকে শরীর দখল করে নেওয়ার সময় দিয়ে অমিত শিকারের পেছনে এসে দাঁড়াল।

আরেকটি সিরিঞ্জে ড্রাগ ভরে পেছনে ফিরতেই জিসান চামকে উঠল। তবে অমিতকে দেখে চিনতে পারল না। ভাবল ইংরেজির প্রভাষক আনোয়ার জামিল। জড়ানো কণ্ঠে বলল, "আপনি কখন এলেন? আপনাকে না বলেছি দরজায় নক না করে ঢুকবেন না? অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে আসবেন না। এখন যান। নতুন মাল এনেছি। আমাকে চেখে দেখতে দিন।"

কথা শেষ করে জিসান উঠে দাঁড়াতে গেল অমিত ঠেলে বসিয়ে দিল। জিসান বলল, "আপনার সাহস তো কম না। আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন। আপনার সব কিছু আমি ফাঁস করে দেব। কি ভেবেছেন আপনি? শিকার করব আমি আর মজা লুটবেন আপনাদের মতো চালবাজরা!"

অমিত জিসানের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো। জিসান অবাক হয়ে বলল, "কে আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছিনা।"

অমিত জিসানের কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আমি অমির বাবা আর তোর যম।" কথা শেষ করা মাত্রই অমিত জিসানের হাতের সিরিঞ্জ জিসানের শরীরে পুশ করল। মুহূর্তে মধ্যে জিসান গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। যে কটা এম্পুল বাকী ছিল অমিত সবগুলোই জিসানের শরীরে ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্তে মধ্যে জিসান গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। এমন ঘুম সেই ঘুম থেকে আর ভাঙ্গবে না। অমিত জিসানের মাথা টেবিলের উপর উপুড় করে রাখল। দেখলে মনে হবে জিসান টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিত হাতের সিরিঞ্জ কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে জিসানের হাতে গুঁজে দিল। তারপর নুবিরার অবচেতন দেহ একটা চাদরে ঢেকে মুখটা ছুঁয়ে আদর করল। মৃদু কণ্ঠে বলল, "আই অ্যাম সরি" বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

১৫

সারাদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। বাড়ি ফিরে শরীর যেন আর চলছিল না। রাতের খাবারের পর শরীর যেন একবারে ছেড়ে দিল। শোবার আগে অরিন্দম চৌধুরী শরীরকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য লাউঞ্জে এসে টিভির রিমোট হাতে নিল। শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকায় কোন চ্যানেলে মনোযোগ ধরে রাখতে পারছিল না। চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে এক চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ লেখা দেখে চ্যানেল পরিবর্তন করা বন্ধ করল।

খবর পাঠিকা বলল, "এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ঘটনাস্থলে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুনির মামুন।"

মুনির মামুন শুরু করল, "মোল্লা মেহেদী অপরাধ জগতে যিনি জিসান সিঙ্গাপুরী নামে পরিচিত চিল, আজ সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির কাসা বিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পনেরোর "গ" ইউনিট থেকে পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মোল্লা মেহেদী ওই ইউনিটয়ে ভাড়া থাকতেন। অতিরিক্ত মাদক সেবনই তার মৃত্যু কারণ বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এবং নিষিদ্ধ মাদক স্পিড তার মৃতদেহের পাশে পরে থাকতে দেখা যায়।

মোল্লা মেহেদী ওরফে জিসান সিঙ্গাপুরীর মৃতদেহের সাথে পুলিশ নায়লা আফরিন নুবিরাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে। নুবিরার বাব মা"র সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান নুবিরার আজ দুপুরে এক বন্ধুর বাসায় গ্রুপ স্টাডি করার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। বিকেলের মধ্যেও যখন নুবিরা ওই বন্ধুর বাড়িতে না পৌঁছান তখন ওই বন্ধু নুবিরার বাব মা"র সাথে যোগাযোগ করে নুবিরাকে পাওয়া যাচ্ছে না সে কথা জানান। নুবিরার বাব মা তখন পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন।

নুবিরাকে ছাড়াও পুলিশ একটি ভিডিও ক্যামেরা, অসংখ্য ভিডিও ক্যাসেট, সিরিঞ্জ, নিষিদ্ধ মাদক স্পিড এবং সাধারণ মানের কিছু আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করে। ভিডিও ক্যাসেটগুলো থেকে পুলিশ জানতে পারে মোল্লা মেহেদী ওরফে জিসান সিঙ্গাপুরী শুধু মাদক ব্যবসার সাথেই জড়িত ছিল না সাথে নারী ও শিশুদের নিয়ে এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল যা এই খবরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভিডিও ক্যাসেটগুলো থেকে পুলিশ জিসান সিঙ্গাপুরী ছাড়াও চার্লস ডারউইন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইংরেজির প্রভাষককে আনোয়ার জামিল নামের এক ব্যক্তিকে সনাক্ত করে এবং পরে তাকে লালমাটিয়া তার নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সন্দেহ করছে জিসান সিঙ্গাপুরী এবং আনোয়ার জামিল কোন আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু পাচারকারী সংঘটনের সদস্য। এরা কারা, এদের উৎপত্তিস্থল কোথায় পুলিশ তা ক্ষতিয়ে দেখছে।

পুলিশ আশা করছে নুবিরাকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে আরো অনেক রহস্যের সমাধান হতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় মঞ্চ অভিনেত্রী মিথিলা রায়হান এবং ডাঃ অমিত রায়হান তনয়া অমি রায়হানের মৃত্যু রহস্য। পুলিশের এমন ধারণার কারণ অমি রায়হানকে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নিচে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। অমির দেহে নিষিদ্ধ মাদক স্পিডের উপস্থিতি ধরা পড়ে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে তার উল্লেখ ছিল। পুলিশ সেই থেকে সন্দেহ করছে অমির মৃত্যুর পেছনে মোল্লা মেহেদীর হাত থাকতে পারে। তবে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করা ভিডিও ক্যাসেটগুলোর মধ্যে অমির কোন ভিডিও ফুটেজ খুঁজে পায়নি।

জ্ঞান ফেরার পর নুবিরা জানান অমি এবং নুবিরা চার্লস ডারউইন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একই ক্লাসে পড়তেন। অমি যেদিন নিখোঁজ হন সেদিন অমি নুবিরার বাড়িতে গ্রুপ স্টাডি করার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। তারপরের ঘটনা সবারই জানা। নুবিরার আরো জানান অমির মাধ্যমে মোল্লা মেহেদী ওরফে জিসান সিঙ্গাপুরীর সাথে পরিচয় ঘটে। তবে তাদের দুজনের কারোই জিসান সিঙ্গাপুরীর সাথে সাধারণ সৌজন্যমূলক কথাবার্তার বাইরে তেমন একটা বন্ধুত্ব ছিল না। নুবিরা বলছেন তারা আরো অনেকের মতো জিসানের শিকার। নুবিরা গ্রেফতার হওয়া শিক্ষক আনোয়ার জামিলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

একজন মানুষের জীবনে বাবা মা"র পর শিক্ষকের স্থান। বাবা মা"রা বিশ্বাস করে ছেলে মেয়েদের শিক্ষকের কাছে পাঠান জ্ঞানার্জনের জন্য। যদি সেই শিক্ষকই হন অবিশ্বাসের পাত্র তবে তা যেমন বাবা মা"র জন্য তেমনি সমাজের জন্যেও মহা দুশ্চিন্তার কারণ।

মুনির মামুন, কাসা বিয়াঙ্কা, ধানমন্ডি থেকে।"

অরিন্দম চৌধুরী খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনভিপ্রেত এই খবরে শরীরে বিশ্রামের পরিবর্তে উত্তেজনা অনুভব করল। বন্ধু অমিতের কথা ভেবে মনটা খচখচ করতে লাগল। ভাবল অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে কি ঝড়টাই না বয়ে গেল ওর জীবনে।

কলিং বেলের শব্দ শুনে অরির ভাবনায় ছেদ পড়ল। দরজা খুলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

"আমি ইন্সপেক্টর আলম খান। ঢাকা সাউথ। অরিন্দম চৌধুরী কি আছেন?"

"জি আমি অরিন্দম চৌধুরী। কি ব্যাপার?"

"আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। অমিত রায়হানের বিষয়ে।"

অরিন্দম চৌধুরী দরজা থেকে সরে গিয়ে ইন্সপেক্টর আলম খানকে ভেতরে আসতে বলল।

"কি ব্যাপার?"

ইন্সপেক্টর আলম খান একটা সাদা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা আপনার দরজার সামনে পড়ে ছিল।"

অরি দেখল খামের উপর অরিন্দম চৌধুরী লেখা।

"খবর জানেন কিছু?"

"টিভিতে খবর দেখছিলাম।"

"আপনার বন্ধুর খবর কিছু জানেন?"

"না, কেন বলুন তো?"

"ভেবেছিলাম খবর শুনলে হয়তো তিনি নিজেই দেখা করতে আসবেন, আসেননি। বাড়িতে লোক পাঠানো হয়েছিল কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ওনার সাথে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল?"

"তা বেশ কিছুদিন হবে। অমি নিখোঁজ হবার পর থেকে ও কিছুদিনের জন্য কাজে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। ভেবেছিলাম ওকে একটু একা থাকতে দিলে হয়তো সবঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বললেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তা কি করে হয়?"

"সেটাই তো কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন? তবে লুকিয়ে থাকলে খুঁজে পেতে একটু সময় লাগবে।"

"আপনি কি ওকে সন্দেহ করছেন?"

"কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যা হোক কোন খবর পেলে প্লিজ জানাবেন।" বলে আলম খান অরির দিকে একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিলেন।

"ঠিক আছে।"

ইন্সপেক্টর আলম খান বিদায় নিলে অরি হাতের খাম খুলল। খুলে অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। দেখল বন্ধু অমিত তার সকল সম্পত্তি ট্রাষ্ট করে তার দেখা শোনার দায়িত্ব অরিকে দিয়েছে।

১৬

রাতের খাবার একাই সারল আলম খান। সালমা আগেই খেয়ে নিয়েছিল। খাবার শেষ করে আলম বেডরুমে এসে দেখল সালমা গভীর মনোযোগে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ল্যাপটপের কিবোর্ড চাপার শব্দ হচ্ছে। কি লিখছে কে জানে। ইদানীং আলমের সালমাকে কিছু বলতে খুব অস্বস্তি হয়। কোন কথার কি মানে ধরে তার কোন ঠিক নেই। খুব সামান্য কথাতেও অস্থির হয়ে বাড়ি মাথায় তুলছে আবার খুব কঠিন বিষয়ে খুব সহজ করে বলছে - ও তাই।

আলম একবার ভাবল বলবে, "ঘুমোবে না?" বলতে যে কথাটা আটকে গেল। আলম ভাবল এই সামান্য কথাটা বলতে যেয়েও কত কঠিন মনে হচ্ছে । কেন হচ্ছে? এই অযাচিত দূরত্বের কারণ কি? যা

হবার হবে, আলম কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, “তুমি কি খুব ব্যস্ত?”

সালমা ল্যাপটপ থেকে চোখ না তুলে বলল, “না।”

“বলছিলাম কি, আমরা দুজনে অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাই না। জীবনটায় কেমন যেন মরচে পড়ে গেছে। শুধু কাজ করলে কি চলবে বলতো? কাজের জন্য বেঁচে থাকা না বেঁচে থাকার জন্য কাজ? ভাবছিলাম দুজনে মিলে কোথাও থেকে ঘুরে আসলে বেশ হত। শুধু তুমি আর আমি।”

সালমা প্রথমে পাত্তা না দিলেও শেষের কথাগুলো শুনে কিবোর্ডের কি চাপা বন্ধ করল। আলম আগের কথার রেশ ধরে বলল, “চল একবার পাহাড় দেখে আসি। ছোট বেলায় বাবা মা আর ভাই বোনদের সাথে একবার পেদা টিং টিং গিয়েছিলাম। রাঙামাটি থেকে নৌকায় করে যেতে হয়। তুমি গিয়েছ কখনও? কাপ্তাই হ্রদের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। দ্বীপের বুকে ছোট ছোট কুড়ে ঘর। সে রকম একটা কুড়ে ঘরে আমরা হারিয়ে যাব। শুধু তুমি আর আমি। দিনের বেলা কুড়ে ঘরের বারান্দা থেকে আমরা পাখি দেখব আর রাতে তারা দেখতে দেখতে জোনাকির গান শুনব। যাবে?”

সালমা এবার আলমের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসী সুরে বলল, “সত্যি বলছ?”

“সত্যি। তিন সত্যি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এমন একটা কুড়ে ঘর দিন সাতেকের জন্যে বুকিংও দিয়ে রেখেছি। এখন তুমি চাইলেই কাল সকালে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।”

সালমা ইন্টারনেটে চ্যাট করছিল। চ্যাটের উইন্ডোতে ভেসে উঠল, “কোথায় দেখা করতে চান?” সালমা উত্তরে লিখেছিল, “বসুন্ধরায়, কাল বিকেল ৪টায়।” আলমের কথায় চ্যাট উইন্ডোর সেন্ড বাটন চাপার আগ মুহূর্তে হাত আটকে গেল। সালমার মনে দূরত্বের যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হয়েছিল তা এক যেন ফুয়ে উড়ে গেল। মনে যত মেঘ সরিয়ে জায়গা করে নিল ভালবাসা।

সালমা ল্যাপটপ বন্ধ করে আলমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।